ছো টো দে র

পথের পাঁচালী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম শ্রেণির দ্রুতপঠনের জন্য

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
পঞ্চম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক :
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
77/2, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-700 016

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠিত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি উচ্চপ্রাথমিক স্তরে ২০১৪ সালের নতুন শিক্ষাবর্ষে বলবৎ করতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। সেই সূত্রে অষ্টম শ্রেণির বাংলা বইয়ের সহায়ক পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে গৃহীত হয়েছে একটি গোটা কিশোর-উপন্যাস, 'ছোটোদের পথের পাঁচালী'। প্রখ্যাত লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসে রয়েছে চিত্তাকর্ষক কল্পনা ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের চমকপ্রদ সম্ভার। মূল 'পথের পাঁচালী' বইটিকে বিশেষজ্ঞ কমিটি সম্পাদনা করে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন। আশা করা যায়, দ্রুতপঠন বই হিসেবে ' ছোটোদের পথের পাঁচালী' শিক্ষার্থীদের সমাদর পাবে। বইটিকে রঙে-রেখায় অসামান্য অবয়ব দিয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পী দেবব্রত ঘোষ। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, একটি গোটা বই পড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পঠন-সামর্থ্য যেমন বাড়বে, অন্যদিকে সক্রিয়তা-নির্ভর অনুশীলনীর মাধ্যমে তাদের ভাষা-সাহিত্যবোধও উন্নত হবে।

এই বইটিও পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধি-র জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

১

মাঘ মাসের শেষ, শীত বেশ আছে। দুই পাশে ঝোপে-ঝোপে ঘেরা সরু মাটির পথ বাহিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কয়েকজন লোক সরস্বতীপূজার বৈকালে গ্রামের বাহিরের মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখিতে যাইতেছিল।

দলের একজন বলিল, ওহে হরি, ভুষণো গোয়ালার দরুন কলাবাগানটা তোমরা কি ফের জমা দিয়েচো নাকি?

হরিহর সায়সূচক কিছু বলিতে গিয়া পিছন ফিরিয়া বলিল, ছেলেটা আবার কোথায় গেল? ও খোকা, খোকা-আ-আ—

পথের বাঁকের আড়াল হইতে একটি ছয়-সাত বছরের ফুটফুটে সুন্দর, ছিপছিপে চেহারার ছেলে ছুটিয়া আসিয়া দলের নাগাল ধরিল। হরিহর বলিল — আবার পিছিয়ে পড়লে এরই মধ্যে? নাও এগিয়ে চলো —

ছেলেটা বলিল — বনের মধ্যে কী গেল বাবা? বড়ো বড়ো কান?

হরিহর প্রশ্নের দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়া নবীন পালিতের সঙ্গে মৎস্য-শিকারের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে পুনরায় আগ্রহের সুরে বলিল — কী দৌড়ে গেল বাবা বনের মধ্যে? বড়ো বড়ো কান?

হরিহর বলিল — কী জানি বাবা, তোমার কথার উত্তর দিতে আমি আর পারিনে! সেই বেরিয়ে অবধি শুরু করেচো এটা কী, ওটা কী, — কী গেল বনের মধ্যে তা কি আমি দেখেচি? নাও এগিয়ে চলো দিকি!

বালক বাবার কথায় আগে আগে চলিল।

হঠাৎ হরিহরের ছেলেটি মহা-উৎসাহে পাশের এক উলুখড়ের ঝোপের দিকে আঙুল তুলিয়া চিৎকার

করিতে করিতে ছুটিয়া গেল — ওই যাচ্ছে বাবা, দ্যাখো বাবা, ওই গেল বাবা, বড়ো বড়ো কান, ওই —

তাহার বাবা পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল, — উঁহু উঁহু উঁহু — কাঁটা কাঁটা কাঁটা — পরে তাড়াতাড়ি আসিয়া খপ করিয়া ছেলের হাতখানি ধরিয়া বলিল, — আঃ বড্ড বিরক্ত কল্লে দেখচি তুমি, একশোবার বারণ কচ্ছি তা তুমি কিছুতেই শুনবে না, ওই জন্যেই তো আনতে চাচ্ছিলাম না।

বালক উৎসাহে ও আগ্রহে উজ্জ্বল মুখ উঁচু করিয়া বাবার মুখের দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

কী বাবা?

হরিহর বলিল — কী তা কী আমি দেখেচি! — শুয়োর-টুয়োর হবে — নাও চলো, ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো —

— শুয়োর না বাবা, ছোট্ট যে! পরে সে নীচু হইয়া দৃষ্ট বস্তুর মাটি হইতে উচ্চতা দেখাইতে গেল।

চলো চলো — হ্যাঁ — আমি বুঝতে পেরেচি, আর দেখাতে হবে না — চলো দিকি!...

নবীন পালিত বলিল — ও হলো খরগোশ, খোকা খরগোশ। এখানে খড়ের ঝোপে খরগোশ থাকে, তাই।

বালক বর্ণ পরিচয়ে 'খ'-এ খরগোশের ছবি দেখিয়াছে কিন্তু তাহা যে জীবন্ত অবস্থায় এরকম লাফাইয়া পালায় বা তাহা আবার সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, একথা সে কখনও ভাবে নাই।

খরগোশ! — জীবন্ত! একেবারে তোমার সামনে লাফাইয়া পালায়; — ছবি না, কাচের পুতুল না — একেবারে কানখাড়া সত্যিকারের খরগোশ। এইরকম ভাঁটগাছ বৈঁচিগাছের ঝোপে! — জল-মাটির তৈরি নশ্বর পৃথিবীতে এ ঘটনা কী করিয়া সম্ভব হইল, বালক তাহা কোনোমতেই ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারিতেছিল না।

সকলে বনে ঘেরা সরু পথ ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল। নদীর ধারে বাবলা ও জিওল গাছের আড়ালে একটি বড়ো ইটের পাঁজার মতো জিনিস নজরে পড়ে, ওটা পুরানো কালের নীলকুঠির জ্বালঘরের ভগ্নাবশেষ।

মাঠের ঝোপঝাপগুলা উলুখড়, বনকলমি, সোঁদাল ও কুলগাছে ভরা। কলমিলতা সারা ঝোপগুলার মাথা বড়ো বড়ো সবুজ পাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়াছে — ভিতরে স্নিগ্ধ ছায়া, ছোটো গোয়ালে, নাটাকাঁটা ও নীল বন-অপরাজিতা ফুল সূর্যের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে, পড়ন্ত বেলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা, পাখির ডাক, চারিধারে প্রকৃতির মুক্ত হাতে ছড়ানো ঐশ্বর্য, রাজার মতো ভাণ্ডার বিলাইয়া দান, কোথাও এতটুকু দারিদ্র্যের আশ্রয় খুঁজিবার চেষ্টা নাই, মধ্যবিত্তের কার্পণ্য নাই। বেলাশেষের ইন্দ্রজালে মাঠ, নদী, বন মায়াময়।

মাঠের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে নবীন পালিত মহাশয় একবার এই মাঠের উত্তর অংশের জমিতে শাঁকআলুর চাষ করিয়া কীরূপ লাভবান হইয়াছিলেন, সে গল্প করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাহা হইতে বর্তমান কালের দুর্মূল্যতা, আষাঢ়ুর বাজারে কুণ্ডুদের গোলদারি দোকান পুড়িয়া যাইবার কথা, গ্রামের দীনু গাঙ্গুলির মেয়ের বিবাহের তারিখ কবে পড়িয়াছে প্রভৃতি বিবিধ আবশ্যকীয় সংবাদের আদান-প্রদান হইতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে বলিল — নীলকণ্ঠ পাখি কই বাবা?

— এই দেখো এখন, বাবলাগাছে এখুনি এসে বসবে —

বালক মুখ উঁচু করিয়া নিকটবর্তী সমুদয় বাবলাগাছের মাথার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মাঠের ইতস্তত নীচু নীচু কুলগাছে অনেক কুল পাকিয়া আছে, বালক অবাক হইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। কয়েকবার কুল পাড়িতে গিয়া বাবার বকুনিতে তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হইল। এত ছোটো গাছে কুল হয়? তাহাদের পাড়ায় যে কুলের গাছ আছে, তাহা খুব উঁচু বলিয়া ইচ্ছা থাকিলেও সে সুবিধা করিতে পারে না। ভারী আঁকুশিটা দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়াও তুলিতে পারে না, কুপথ্যের জিনিস লুকাইয়া খাওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে — এ সে টের পায়।

হরিহর বলিল — কুঠি কুঠি বলছিলে, ওই দ্যাখো খোকা, সাহেবদের কুঠি, দেখেচো?

নদীর ধারের অনেকটা জুড়িয়া সেকালের কুঠিটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হিংস্র জন্তুর কঙ্কালের মতো পড়িয়াছিল।

বালক অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহার ছয় বৎসরের জীবনে এই প্রথম সে বাড়ি হইতে এত দূরে আসিয়াছে। এতদিন নেড়াদের বাড়ি, নিজেদের বাড়ির সামনেটা, বড়োজোর রানুদিদিদের বাড়ি, ইহাই ছিল তাহার জগতের সীমা। কেবল এক একদিন তাহাদের পাড়ার ঘাটে মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে আসিয়া সে স্নানের ঘাট হইতে আবছায়া দেখিতে পাওয়া কুঠির ভাঙা জ্বালঘরটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত — আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত, মা, ওদিকে কি সেই কুঠি?

সে তাহার বাবার মুখে, দিদির মুখে, আরও পাড়ার কত লোকের মুখে কুঠির মাঠের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার প্রথম সেখানে আসা! ওই মাঠের পরে ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য? শ্যাম-লঙ্কার দেশে, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গাছের নীচে নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায়? ও-ধারে আর মানুষের বাস নাই, জগতের শেষ সীমাটিই এই। ইহার পর হইতে অসম্ভবের দেশ, অজানার দেশ শুরু হইয়াছে।

বাড়ি ফিরিবার পথে সে পথের ধারের একটা নীচু ঝোপ হইতে একটা উজ্জ্বল রং-এর ফলের থোলো ছিঁড়িতে হাত বাড়াইল। তাহার বাবা বলিল, হাঁ হাঁ, হাত দিয়ো না হাত দিয়ো না, — আলকুশি আলকুশি। কী যে তুমি করো বাবা! বড্ড জ্বালালে দেখচি। আর কোনোদিন কোথাও নিয়ে বেরুচ্চিনে বলে দিলাম — এক্ষুনি হাত চুলকে ফোসকা হবে — পথের মাঝখান দিয়ে এত করে বলচি হাঁটতে — তা তুমি কিছুতেই শুনবে না। —

— হাত চুলকুবে, কেন বাবা ?

— হাত চুলকুবে, বিষ বিষ — আলকুশিতে কি হাত দেয় বাবা? শুঁয়ো ফুটে রি রি করে জ্বলবে এক্ষুনি — তখন তুমি চিৎকার শুরু করবে।

গ্রামের মধ্যে দিয়া হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া খিড়কির দোর দিয়া বাড়ি ঢুকিল। সর্বজয়া খিড়কির দোর খোলার শব্দে বাহিরে আসিয়া বলিল — এই এত রাত হলো! তা ওকে নিয়ে গিয়েচ, না একটা দোলাই গায়ে না কিছু!

হরিহর বলিল,— আঃ, নিয়ে গিয়ে যা বিরক্ত! এদিকে যায়, ওদিকে যায়, সামলে রাখতে পারিনে — আলকুশির ফল ধরে টানতে যায়। পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল, কুঠির মাঠ দেখব, কুঠির মাঠ দেখব— কেমন, হলো তো কুঠির মাঠ দেখা?

২

সকালবেলা। আটটা কী নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে, তাহার একটা ছোটো টিনের বাক্স আছে, সেটার ডালা ভাঙা। বাক্সের সমুদয় সম্পত্তি সে উপুড় করিয়া মেঝেতে ঢালিয়াছে। একটা রং-ওঠা কাঠের ঘোড়া, চার পয়সা দামের, একটা টোল-খাওয়া টিনের ভেঁপু-বাঁশি, গোটাকতক কড়ি। এগুলি সে মায়ের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মীপূজার কড়ির চুপড়ি হইতে খুলিয়া লইয়াছিল ও পাছে কেহ টের পায় এই ভয়ে সর্বদা লুকাইয়া রাখে, একটা দু-পয়সা দামের পিস্তল, কতকগুলো শুকনো নাটা ফল — দেখিতে ভালো বলিয়া তাহার দিদি কোথা হইতে অনেকগুলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল, কিছু তাহাকে দিয়াছে, কিছু সে নিজের পুতুলের বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে। খানকতক খাপরার কুচি। গঙ্গা-যমুনা খেলিতে এই খাপরাগুলির লক্ষ্য অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায় সে এগুলি সযত্নে বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে, এগুলি তাহার মহামূল্যবান সম্পত্তি। এতগুলি জিনিসের মধ্যে সবে সে টিনের বাঁশিটা কয়েকবার বাজাইয়া সেটির সম্বন্ধে বিগতকৌতূহল হইয়া তাহাকে এক পাশে রাখিয়া দিয়াছে। কাঠের ঘোড়া নাড়াচাড়া করা হইয়া গিয়াছে। সেটিও এক পাশে পিঁজরাপোলের আসামির ন্যায় পড়িয়া আছে। বর্তমানে সে গঙ্গা-যমুনা খেলিবার খাপরাগুলিকে হাতে লইয়া মনে মনে দাওয়ার উপর গঙ্গা-যমুনার ঘর আঁকা কল্পনা করিয়া চোখ বুজিয়া খাপরা ছুঁড়িয়া দেখিতেছে। তাক ঠিক হইতেছে কিনা!

এমন সময়ে তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল — অপু — ও অপু —। সে এতক্ষণ বাড়ি ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্কতামিশ্রিত। মানুষের গলার আওয়াজ পাইয়া অপু কলের পুতুলের মতো লক্ষ্মীর চুপড়ির কড়িগুলি তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিল। পরে বলিল — কী রে দিদি?

দুর্গা হাত নাড়িয়া ডাকিল — আয় এদিকে — শোন্ —

দুর্গার বয়স দশ-এগারো বৎসর হইল। গড়ন পাতলা পাতলা, রং অপুর মতো অতটা ফর্সা নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ — বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপুর মতো চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর। অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল, — কী রে?

দুর্গার হাতে একটা নারিকেলের মালা। সেটি সে নীচু করিয়া দেখাইল, কতকগুলি কচি আম কাটা। সুর নীচু করিয়া বলিল — মা ঘাট থেকে আসেনি তো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল — উঁহু —

দুর্গা চুপি চুপি বলিল — একটু তেল আর নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমের কুসি জারাবো —

অপু আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল — কোথায় পেলি রে দিদি?

দুর্গা বলিল— পট্‌লিদের বাগানে সিঁদুরকোটোর তলায় পড়ে ছিল—আন্ দিকি একটু নুন আর তেল।

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল — তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মারবে যে? আমার কাপড় যে বাসি?

তুই যা না শিগগির করে, মা আসতে এখন ঢের দেরি — ক্ষার কাচতে গিয়েচে — শিগ্‌গির যা —

অপু বলিল — নারকেলের মালাটা আমায় দে। ওতে ঢেলে নিয়ে আসব — তুই খিড়কিদোরে গিয়ে দ্যাখ মা আসছে কিনা।

দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল, তেল-টেল যেন মেঝেতে ঢালিসনে, সাবধানে নিবি, নইলে মা টের পাবে — তুই তো একটা হাবা ছেলে —

অপু বাড়ির মধ্যে হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল, — বলিল, নে হাত পাত।

— তুই অতগুলো খাবি দিদি?

— অতগুলো বুঝি হলো? এই তো — ভারি বেশি — যা, আচ্ছা নে আর দু-খানা — বাঃ দেখতে বেশ হয়েছে রে, একটা লঙ্কা আনতে পারিস? আর একখানা দেবো তাহলে —

— লঙ্কা কী করে পাড়ব দিদি? মা যে তক্তার ওপর রেখে দ্যায়, আমি যে নাগাল পাইনে?

তবে থাক্‌গে যাক — আবার ওবেলা আন্‌ব এখন — পট্‌লিদের ডোবার ধারের আমগাছটায় গুটি যা ধরেচে — দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে —

দুর্গাদের বাড়ির চারিদিকেই জঙ্গল। হরিহর রায়ের জ্ঞাতি-ভ্রাতা নীলমণি রায় সম্প্রতি গত বৎসর মারা গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া নিজ পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। কাজেই পাশের এ ভিটাও জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। নিকটে আর কোনো লোকের বাড়ি নাই। পাঁচ মিনিটের পথ গেলে তবে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি।

হরিহরের বাড়িটাও অনেক দিন হইয়া গেল মেরামত হয় নাই, সামনের দিকের রোয়াক ভাঙা, ফাটলে বন-বিছুটির ও কালমেঘ গাছের বন গজাইয়াছে — ঘরের দোর-জানালার কপাট সব ভাঙা, নারিকেলের দড়ি দিয়া গরাদের সঙ্গে বাঁধা আছে।

খিড়কি দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শুনা গেল — দুগ্‌গা, ও দুগ্‌গা —

দুর্গা বলিল — মা ডাকছে, যা দেখে আয় — ওখানা খেয়ে যা — মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে, মুছে ফ্যাল্ —

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভরতি। সে তাড়াতাড়ি জারানো আমের চাক্‌লাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠালগাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। খাইতে খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনতাসূচক হাসি হাসিল। দুর্গা খালি মালাটা এক টান মারিয়া ভেরেন্ডা-কচার বেড়া পার করিয়া নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল — মুখটা মুছে ফ্যাল্ না বাঁদর — নুন লেগে রয়েছে যে ...

পরে দুর্গা নিরীহমুখে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বলিল — কী মা?

—কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাব? সকাল থেকে ক্ষার কেচে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল, একটুখানি যদি কোনো দিক থেকে আসান আছে তোমাদের দিয়ে—অত বড়ো মেয়ে, সংসারের কুটোগাছটা ভেঙে দু-খানা করা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো টো টোক্‌লা সেধে বেড়াচ্ছেন—সে বাঁদর কোথায়?

অপু আসিয়া বলিল, মা খিদে পেয়েছে।

রোসো রোসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু ... একটুখানি হাঁপ জিরোতে দাও! তোমাদের রাতদিন খিদে আর রাতদিন ফাইফরমাজ। ও দুগ্‌গা, দ্যাখ্ তো বাছুরটা হাঁক পাড়ছে কেন?

খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল — আর এট্টু আটা বের করো না মা, মুখে বড্ড লাগে।

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সংকুচিত সুরে বলিল — চালভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে খাইতে বলিল — উঃ, চিবোনো যায় না। আম খেয়ে দাঁত টকে —

দুর্গার ভ্রূকুটিমিশ্রিত চোখ-টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল, — আম কোথায় পেলি?

সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল — তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

দুর্গা বিপন্নমুখে বলিল — ওকে জিজ্ঞেস করো না? আমি — এই তো এখন কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে — তুমি যখন ডাকলে তখন তো —

স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল — যা, বাছুরটা ধরগে যা — ডেকে ডেকে সারা হলো — কমলে বাছুর, ও সন্ন, এত বেলা করে এলে কি বাঁচে? একটু সকাল করে না এলে এই তেতপ্পর পজ্জন্ত বাছুর বাঁধা —

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তাহার পিঠে দুম্ করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল — লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! পরে মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল — আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে — আবার কোনো দিন আম দেবো খেয়ো — ছাই দেবো — এই ওবেলাই পট্লিদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জারাবো, এত বড়ো বড়ো গুটি হয়েছে, মিষ্টি যেন গুড় — দেবো তোমায়? খেয়ো এখন? হাবা একটা কোথাকার — যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে!

দুপুরের কিছু পরে হরিহর কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিল। সে আজকাল গ্রামের অন্নদা রায়ের বাটীতে গোমস্তার কাজ করে। জিজ্ঞাসা করিল — অপুকে দেখচিনে?

সর্বজয়া বলিল — অপু তো ঘুমুচ্ছে।

— দুগ্‌গা বুঝি —

— সে সেই খেয়ে বেরিয়েচে — সে বাড়ি থাকে কখন? দুটো খাওয়ার সঙ্গে যা সম্পর্ক! আবার সেই খিদে পেলে তবে আসবে — কোথায় কার বাগানে, কার আমতলায় জামতলায় ঘুরছে — এই চত্তির মাসের রোদ্দুরে, ফের দ্যাখো না এই জ্বরে পড়ল বলে — অত বড়ো মেয়ে, বলে বোঝাব কত? কথা শোনে, না কানে নেয়?

এই সময়ে মেয়ে দুর্গা কোথা হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া বাহিরের দুয়ারের আড়াল হইতে সতর্কতার সহিত একবার উঁকি মারিল এবং অপর পক্ষ সম্পূর্ণ সজাগ দেখিয়া ও-ধারে পাঁচিলের পাশ বাহিয়া বাহির বাটীর রোয়াকে উঠিল। উঠানে নামিয়া সে কাঁঠাল তলায় দাঁড়াইয়া কী করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া নিরুৎসাহভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

পরে হঠাৎ কী ভাবিয়া রুক্ষ চুলগুলি বাতাসে উড়াইতে উড়াইতে মহা খুশির সহিত পুনরায় সোজা বাটীর বাহির হইয়া গেল।

অপুদের বাড়ি হইতে কিছু দূরে একটি খুব বড়ো অশ্বত্থ গাছ ছিল। কেবল তাহার মাথাটা উহাদের দালানের জানালা কি রোয়াক হইতে দেখা যায়। অপু মাঝে মাঝে সেই দিকে চাহিয়া দেখিত। যতবার সে চাহিয়া দেখে, ততবার তাহার যেন অনেক — অনেক — অনেক দূরের কোন দেশের কথা মনে হয় — কোন দেশ, এ তাহার ঠিক ধারণা হইত না — কোথায় যেন কোথাকার দেশ --- মার মুখে ওই সব দেশের রাজপুত্তুরদের কথাই সে শোনে।

অনেক দূরের কথায় তাহার শিশু মনে একটা বিস্ময়মাখানো আনন্দের ভাবের সৃষ্টি করিত। নীল রং-এর আকাশটা অনেক দূর, ঘুড়িটা — কুঠির মাঠটা অনেক দূর, — সে বুঝাইতে পারিত না, বলিতে পারিত না কাহাকেও, কিন্তু এসব কথায় তাহার মন যেন কোথায় উড়িয়া চলিয়া যাইত — এবং সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে, অনেক দূরের এই কল্পনা তাহার মনকে অত্যন্ত চাপিয়া তাহাকে যেন কোথায় লইয়া ফেলিয়াছে — ঠিক সেই সময়েই মায়ের জন্য তাহার মন কেমন করিয়া উঠিত, যেখানে সে যাইতেছে সেখানে তাহার মা নাই, অমনি মায়ের কাছে যাইবার জন্য মন আকুল হইয়া পড়িত। কতবার যে এ রকম হইয়াছে। আকাশের গায়ে অনেক দূরে একটা চিল উড়িয়া যাইতেছে — ক্রমে ছোট্ট — ছোট্ট — ছোট্ট হইয়া নীলুদের তালগাছের উঁচু মাথাটা পিছনে ফেলিয়া দূর আকাশে ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে — চাহিয়া দেখিতে দেখিতে যেমন উড়ন্ত চিলটা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যাইত, অমনি সে চোখ নামাইয়া লইয়া বাহিরবাটী হইতে একদৌড়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া গৃহকার্যরত মাকে জড়াইয়া ধরিত। মা বলিত — দ্যাখো, দ্যাখো, ছেলের কাণ্ড দ্যাখো — ছাড় — ছাড় — দেখছিস সকড়ি হাত? ... ছাড়ো মানিক আমার, সোনা আমার, তোমার জন্যে এই দ্যাখো চিংড়িমাছ ভাজচি — তুমি যে চিংড়িমাছ

ভালোবাসো? হ্যাঁ, দুষ্টুমি করে না — ছাড়ো।

আহারাদির পর দুপুরবেলা তাহার মা কখনও কখনও জানালার ধারে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছেঁড়া কাশীদাসী মহাভারতখানা সুর করিয়া পড়িত। বাড়ির ধারে নারিকেল গাছটাতে শঙ্খচিল ডাকিত, অপু নিকটে বসিয়া হাতের লেখা ক-খ লিখিতে লিখিতে একমনে মায়ের মুখের মহাভারত পড়া শুনিত।

জানালার বাহিরে বাঁশবনের, দুপুরের রৌদ্র-মাখানো শেওড়া ঘেঁটু বনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মহাভারতের — বিশেষত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে সে তন্ময় হইয়া যায়। মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কর্ণের চরিত্র বড়ো ভালো লাগে তাহার কাছে। ইহার কারণ কর্ণের উপর তাহার কেমন একটা মমতা হয়। রথের চাকা মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছে — এক হাতে প্রাণপণে সেই চাকা মাটি হইতে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন — সেই নিরস্ত্র, অসহায় বিপন্ন, কর্ণের অনুরোধ মিনতি উপেক্ষা করিয়া অর্জুন তির ছুড়িয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেন! মায়ের মুখে এই অংশ শুনিতে শুনিতে দুঃখে অপুর শিশুহৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত, চোখের জল বাগ মানিত না — চোখ ছাপাইয়া তাহার নরম তুলতুলে গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িত — সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখে চোখে জল পড়ার যে আনন্দ, তাহা তাহার মনোরাজ্যে নব অনুভূতি সজীবত্ব লইয়া পরিচিত হইতে লাগিল।

বেলা পড়িলে মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে, সে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশ্বত্থ গাছটার দিকে এক একদিন চাহিয়া দেখে — হয়তো কড়া চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্রে গাছটার মাথা ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট, নয় তো বৈকালের রাঙা রোদ অলসভাবে গাছটার মাথায় জড়াইয়া আছে।

সকালের চেয়ে এই বৈকালের রাঙা-রোদ-মাখানো গাছটার দিকে চাহিয়াই তাহার মন কেমন করিত। কর্ণ যেন ওই অশ্বত্থ গাছটার ওপারে আকাশের তলে, অনেক দূরে কোথায় এখনও মাটি হইতে রথের চাকা দুই হাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিতেছে — রোজই তোলে — মহাবীর, কিন্তু চিরদিনের কৃপার পাত্র কর্ণ!

এক একদিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনি শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হয় যুদ্ধ জিনিসটা মহাভারতে বড়ো কম লেখা আছে। ইহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য এবং আশ মিটাইয়া যুদ্ধ জিনিসটা উপভোগ করিবার জন্য সে এক উপায় বাহির করিয়াছে। একটা বাখারি কিংবা হালকা কোনো গাছের ডালকে অস্ত্রস্বরূপ হাতে লইয়া সে বাড়ির পিছনে বাঁশবাগানের পথে অথবা বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপনমনে বলে ---

তারপর দ্রোণ তো একেবারে দশ বাণ ছুঁড়লেন, অর্জুন করলেন কী, একেবারে দুশোটা বাণ দিলেন মেরে! তারপর — ওঃ — সে কী যুদ্ধ। কী যুদ্ধ! বাণের চোটে চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেল! (এখানে সে মনে মনে যতগুলি বাণ হইলে তাহার আশা মিটে তাহার কল্পনা করে, যদিও তাহার কল্পনার ধারা মা-র মুখে কাশীদাসী মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের প্রণালী সম্বন্ধে যাহা শুনা আছে তাহা অতিক্রম করে না) তারপর তো অর্জুন করলেন কী, ঢাল তরোয়াল নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন — পরে এই যুদ্ধ! দুর্যোধন এলেন — ভীম এলেন — বাণে বাণে আকাশ অন্ধকার করে ফেলেছে — আর কিছু দেখা গেল না।... মহাভারতের রথিগণ মাত্র অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া নাম কিনিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রক্ত-মাংসের দেহে জীবন্ত থাকিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, যশোলাভের পথ ক্রমশই কীরূপ দুর্গম হইয়া পড়িতেছে। বালকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে তাঁহারা মাসের পর মাস সমানভাবে অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেন কি?

গ্রীষ্মকালের দিনটা, বৈশাখের মাঝামাঝি!

নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের ধারে সেদিন দুপুরের কিছু পূর্বে দ্রোণগুরু বড়ো বিপদে পড়িয়াছেন — কপিধ্বজ রথ একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপরে, গাণ্ডীব-ধনু হইতে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্ত হইবার বিলম্ব চক্ষের পলক মাত্র, কুরুসৈন্যদলে হাহাকার উঠিয়াছে — এমন সময় শেওড়া বনের ওদিক হইতে হঠাৎ কে কৌতুকের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, — ও কী রে অপু? অপু চমকিয়া উঠিয়া আকর্ণ টানা জ্যা-কে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল তাহার দিদি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। অপু চাহিতেই বলিল — হ্যাঁরে পাগলা, আপন মনে কী বকচিস বিড়বিড় করে, আর হাত পা নাড়চিস? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে ভাই-এর কচি গালে চুমু খাইয়া বলিল — পাগল!... কোথাকার একটা পাগল, কী বকছিলি রে আপন মনে?

অপু লজ্জিত মুখে বারবার বলিতে লাগিল — যাঃ ... বকছিলাম বুঝি? ... আচ্ছা, যাঃ —

অবশেষে দুর্গা হাসি থামাইয়া বলিল — আয় আমার সঙ্গে ...

পরে সে অপুর হাত ধরিয়া বনের মধ্যে লইয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া হাসিমুখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল — দেখেচিস্? ... কত নোনা পেকেচে? ... এখন কী করে পাড়া যায় বল দিকি?

অপু বলিল — উঃ অনেক রে দিদি! — একটা কঞ্চি দিয়ে পাড়া যায় না?

দুর্গা বলিল — তুই এক কাজ কর, ছুটে গিয়ে বাড়ির মধ্যে থেকে আঁকুশিটা নিয়ে আয় দিকি! আঁকুশি দিয়ে টান দিলে পড়ে যাবে দেখিস এখন —

অপু বলিল — তুই এখানে দাঁড়া দিদি, আমি আনচি।

অপু আঁকুশি আনিলে দুজনে মিলিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও চার-পাঁচটার বেশি ফল পাড়িতে পারিল না — খুব উঁচু গাছ, সর্বোচ্চ ডালে যে ফল আছে তাহা দুর্গা আঁকুশি দিয়াও নাগাল পাইল না। পরে সে বলিল — চল আজ এইগুলো নিয়ে যাই, নাইবার বেলায় মাকে সঙ্গে আনব — মার হাতে ঠিক নাগাল আসবে। দে নোনাগুলো আমার কাছে, তুই আঁকুশিটা নে। নোলক পরবি?

একটা নীচু ঝোপের মাথায় ওড়কলমি লতায় সাদা সাদা ফুলের কুঁড়ি, দুর্গা হাতের ফলগুলো নামাইয়া নিকটের ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়িতে লাগিল। বলিল — এদিকে সরে আয়, নোলক পরিয়ে দি —

তাহার দিদি ওড়কলমি ফুলের নোলক পরিতে ভালোবাসে, বনজঙ্গল সন্ধান করিয়া সে প্রায়ই খুঁজিয়া আনিয়া নিজে পরে ও ইতিপূর্বে কয়েকবার অপুকেও পরাইয়াছে! অপু কিন্তু মনে মনে নোলক পরা পছন্দ করে না। তাহার ইচ্ছা হইল বলে, নোলকে তাহার দরকার নাই। তবে দিদির ভয়ে সে কিছু

বলিল না। দিদিকে চটাইবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই, কারণ দিদিই বনজঙ্গল ঘুরিয়া কুলটা, জামটা, নোনাটা, আমড়াটা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে লুকাইয়া খাওয়ায়, এমন সব জিনিস জুটাইয়া আনে, যাহা হয়তো কুপথ্য হিসাবে উহাদের খাইতে নিষেধ আছে। কাজেই অন্যায় হইলেও দিদির কথা না শুনা তাহার সাহসে কুলায় না।

একটা কুঁড়ি ভাঙিয়া সাদা জলের মতো যে আঠা বাহির হইল, তাহার সাহায্যে দুর্গা অপুর নাকে কুঁড়িটি আঁটিয়া দিল, পরে নিজেও একটা পরিল — তারপর ভাইয়ের চিবুকে হাত দিয়া নিজের দিকে ভালো করিয়া ফিরাইয়া বলিল — দেখি, কেমন দেখাচ্ছে? বাঃ বেশ হয়েছে — চল মাকে দেখাইগে —

অপু লজ্জিত মুখে বলিল — না দিদি —

— চল না — খুলে ফেলিস্‌নে যেন — বেশ হয়েচে —

বাড়ি আসিয়া দুর্গা নোনাফলগুলি রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইয়া রাখিল। সর্বজয়া রাঁধিতেছিল — দেখিয়া খুব খুশি হইয়া বলিল — কোথায় পেলি রে?

দুর্গা বলিল — ওই লিচু জঙ্গলে — অনেক আছে, কাল গিয়ে তুমি পাড়বে মা? এমন পাকা — একেবারে সিঁদুরের মতো রাঙা —

সে আড়াল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল — দ্যাখো মা —

অপু নোলক পরিয়া দিদির পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। সর্বজয়া হাসিয়া বলিল — ও মা! ও আবার কে রে? — কে চিনতেত পারচি নে?

অপু লজ্জায় তাড়াতাড়ি নাকের ডগা হইতে ফুলের কুঁড়ি খুলিয়া ফেলিল। বলিল — ওই দিদি পরিয়ে দিয়েচে —

দুর্গা হঠাৎ বলিয়া উঠিল — চল রে অপু, ওই কোথায় ডুগডুগি বাজচে, চল, বাঁদর খেলাতে এসেচে ঠিক, শিগগির আয় —

আগে আগে দুর্গা ও তাহার পিছনে পিছনে অপু ছুটিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। সম্মুখে পথ বাহিয়া, বাঁদর নয়, ও পাড়ার চিনিবাস ময়রা মাথায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। চিনিবাস হরিহর রায়ের দুয়ার দিয়া গেলেও এ বাড়ি ঢুকিল না। কারণ সে জানে এ বাড়ির লোক কখনও কিছু কেনে না। তবুও দুর্গা-অপুকে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল — চাই নাকি?

অপু দিদির মুখের দিকে চাহিল। দুর্গা চিনিবাসের দিকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল — নাঃ—

চিনিবাস ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি গিয়া মাথার চাঙারি নামাইতেই বাড়ির ছেলে-মেয়েরা কলরব করিতে করিতে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভুবন মুখুজ্যে অবস্থাপন্ন লোক, বাড়িতে পাঁচ-ছয়টা গোলা আছে, এ গ্রামে অন্নদা রায়ের নীচেই জমিজমা ও সম্পত্তি বিষয়ে তাঁহার নাম করা যাইতে পারে।

ভুবন মুখুজ্যের স্ত্রী বহুদিন মারা গিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার সেজো ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী এ সংসারের কর্ত্রী।

সেজো-বউ-এর বয়স চল্লিশের উপর হইবে, অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

সেজো-বউ একখানা মাজা পিতলের সরায় করিয়া চিনিবাসের নিকট হইতে মুড়কি, সন্দেশ, বাতাসা দশহরা পূজার জন্য লইলেন। ভুবন মুখুজ্যের ছেলেমেয়ে ও তাঁহার নিজের ছেলে সুনীল সেইখানেই

দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের জন্যও খাবার কিনিলেন। পরে অপুকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা চিনিবাসের পিছন পিছন ঢুকিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সেজো বউ নিজের ছেলে সুনীলের কাঁধে হাত দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন — যাও না, রোয়াকে উঠে গিয়ে খাও না। এখানে ঠাকুরের জিনিস, মুখ থেকে ফেলে এঁটো করে বসবে।

চিনিবাস চাঙারি মাথায় তুলিয়া পুনরায় অন্য বাড়ি চলিল। দুর্গা বলিল — আয় অপু, চল্ দেখিগে টুনুদের বাড়ি —

ইহারা সদর দরজা পার হইতেই সেজো-বউ মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন — দেখতে পারিনে বাপু, ছুঁড়িটার যে কী হ্যাংলা স্বভাব — নিজের বাড়ি আছে, গিয়ে বসে কিনে খেগে যা না? তা না লোকের দোর দোর —যেমন মা তেমনি ছা —

ইহাদের বাটীর বাহির হইয়া দুর্গা ভাইকে আশ্বাস দিবার সুরে বলিল — চিনিবাসের ভারি তো খাবার! বাবার কাছ থেকে দেখিস রথের সময় চারটে পয়সা নেব — তুই দুটো, আমি দুটো। তুই আমি মুড়কি কিনে খাব —

খানিকটা পরে ভাবিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল — রথের আর কতদিন আছে রে দিদি?

৪

কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া একবাটি দুধ-ভাত মাখিয়া পুত্রকে খাওয়াইতে বসিল। দেখি হাঁ কর্ — তোমার কপালখানা — মণ্ডা না মেঠাই না, দুটো ভাত আর ভাত — তা ছেলের দশা দেখলে হয়ে আসে — রোজ ভাত খেতে বসে মুখ কাঁচুমাচু — বাঁচবে কী খেয়ে? বাঁচতে কি এসেচ? আমায় জ্বালাতে এসেচ বই তো নয় — ও-রকম মুখ ঘুরিয়ো না, ছিঃ — হাঁ করো লক্ষ্মী — দেখি এই দলাটা হলেই হয়ে গেল — আবার ওবেলা টুনুদের বাড়ি মনসার ভাসান হবে। তুই জানিস নে বুঝি? শিগ্‌গির খেয়ে নিয়ে চল। আমরা সব —

দুর্গা বাড়ি ঢুকিল। কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিতেছে। এক পা ধূলা, কপালের সামনে একগোছা চুল সোজা হইয়া প্রায় চার আঙুল উঁচু হইয়া আছে। সে সবসময় আপন মনে ঘুরিতেছে — পাড়ার সমবয়সি ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাহার বড়ো একটা খেলাধূলা নাই — কোথায় কোন ঝোপে বৈঁচি পাকিল, কাদের বাগানে কোন গাছটায় আমের গুটি বাঁধিয়াছে, কোন বাঁশতলায় শেয়াকুল খাইতে মিষ্ট — এসব তাহার নখদর্পণে। পথে চলিতে চলিতে সে সর্বদা পথের দুই পাশে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে চলিয়াছে — কোথাও কাঁচপোকা বসিয়া আছে কিনা! যদি কোথাও কণ্টিকারী গাছের পাকা ফল দেখিতে পাইল,

তৎক্ষণাৎ খেলাঘরের বেগুন করিবার জন্য তাহা তুলিতে বসিয়া যাইবে। হয়তো পথে কোথাও বসিয়া সে নানারকমের খাপরা লইয়া ছুড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, গঙ্গা-যমুনা খেলায় কোনখানায় ভালো তাক হয় — পরীক্ষায় যেখানা ভালো বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সেখানা সে সযত্নে আঁচলে বাঁধিয়া লইবে। সর্বদাই সে পুতুলের বাক্স ও খেলাঘরের সরঞ্জাম লইয়া মহাব্যস্ত।

সে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল। সর্বজয়া বলিল — এলে! এসো, ভাত তৈরি। খেয়ে আমায় উদ্ধার করো — তারপর আবার কোন দিকে বেরুতে হবে বেরোও। বোশেখ মাসের দিন সকলের মেয়ে দেখোগে যাও সেঁজুতি করচে, শিবপুজো করচে — আর অত বড়ো ধাড়ি মেয়ে — দিনরাত কেবল টো টো। সেই সকাল হতে না হতে বেরিয়েচে, আর এখন এই দুপুর ঘুরে গিয়েচে, এখন এল বাড়ি — মাথাটার ছিরি দেখো না! না একটু তেল দেওয়া, না একটু চিরুনি ছোঁয়ানো —

সর্বজয়ার কথা শেষ হইবার পূর্বেই এক ব্যাপার ঘটিল। আগে আগে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির সেজ ঠাকরুণ পিছনে পিছনে তাঁহার মেয়ে টুনু ও দেওরের ছেলে সতু, তাহাদের পিছনে আর চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে সম্মুখের দরজা দিয়া বাড়ি ঢুকিল। সেজ ঠাকরুণ কোনো দিকে না চাহিয়া বাড়ির কাহারও সহিত কোনো আলাপ না করিয়া সোজা হন হন করিয়া ভিতরের দিকের রোয়াকে উঠিলেন। নিজের ছেলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন — কই নিয়ে আয় — বের কর পুতুলের বাক্স, দেখি —

এ বাড়ির কেহ কোনো কথা বলিবার পূর্বেই টুনু ও সতু দুজনে মিলিয়া দুর্গার টিনের পুতুলের বাক্সটা ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রোয়াকে নামাইল এবং টুনু বাক্স খুলিয়া খানিকটা খুঁজিবার পর একছড়া পুঁতির মালা বাহির করিয়া বলিল — এই দ্যাখো মা, আমার সেই মালাটা — সেদিন যে সেই খেলতে গিয়েছিল, সেদিন চুরি করে এনেচে।

সতু বাক্সের এক কোণ সন্ধান করিয়া গোটাকতক আমের গুটি বাহির করিয়া বলিল — এই দেখো জেঠিমা, আমাদের সোনামুখী গাছের আম পেড়ে এনেচে।

ব্যাপারটা এত হঠাৎ হইয়া গেল বা ইহাদের গতিবিধি এ বাড়ির সকলের কাছেই এত রহস্যময় মনে হইল যে এতক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হয় নাই। এতক্ষণ পরে সর্বজয়া কথা খুঁজিয়া বলিল — কী, কী খুড়িমা? কী হয়েচে? পরে সে রান্নাঘরের দাওয়া হইতে ব্যগ্রভাবে উঠিয়া আসিল।

— এই দেখো না কী হয়েচে, কীর্তিখানা দেখো না একবার — তোমার মেয়ে সেদিন খেলতে গিয়ে টুনুর পুতুলের বাক্স থেকে এই পুঁতির মালা চুরি করে নিয়ে এসেচে — মেয়ে কদিন থেকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। তারপর সতু গিয়ে বললে যে, তোর পুঁতির মালা দুগ্‌গাদিদির বাক্সের মধ্যে দেখে এলাম — দেখো একবার কাণ্ড — তোমার ও মেয়ে কম নাকি? চোর — চোরের বেহদ্দ চোর — আর ওই দেখো না — বাগানের আমগুলো গুটি পড়তে দেরি সয় না — চুরি করে নিয়ে এসে বাক্সে লুকিয়ে রেখেচে।

যুগপৎ দুই চুরির অতর্কিততায় আড়ষ্ট হইয়া দুর্গা পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল — এনিচিস এই মালা ওদের বাড়ি থেকে?

দুর্গা কথার উত্তর দিতে না দিতে সেজো বউ বলিলেন — না আনলে কি আর মিথ্যে করে বলচি

নাকি! বলি এই আম কটা দেখো না? সোনামুখীর আম চেন না না কি? এও কি মিথ্যে কথা?

সর্বজয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল — না সেজোখুড়ি, আপনার কথা মিথ্যে তা তো বলিনি! আমি ওকে জিগ্যেস করচি।

সেজো ঠাকরুণ হাত নাড়িয়া ঝাঁজের সহিত বলিলেন — জিজ্ঞেস করো আর যা করো বাপু, ও মেয়ে সোজা মেয়ে হবে না আমি বলে দিচ্চি — এই বয়েসে যখন চুরিবিদ্যে ধরেচে, তখন এর পর যা হবে সে টেরই পাবে। চল রে সতু — নে আমের গুটিগুলো বেঁধে নে — বাগানের আমগুলো লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ির জ্বালায় যদি চোখে দেখবার জো আছে!

অপমানে দুঃখে সর্বজয়ার চোখে জল আসিল। সে ফিরিয়া দুর্গার রুক্ষ চুলের গোছা টানিয়া ধরিয়া ডাল-ভাত মাখা হাতেই দুড়-দাড় করিয়া তাহার পিঠে কিলের উপর কিল ও চড়ের উপর চড় মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল—আপদ-বালাই একটা কোত্থেকে এসে জুটেছে—মলে ও আপদ চুকে যায়—মরেও না যে বাঁচি—হাড় জুড়োয়—বেরো বাড়ি থেকে, দূর হয়ে যা—যা এক্ষুনি বেরো—

দুর্গা মার খাইতে খাইতে ভয়ে খিড়কি-দোর দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার ছেঁড়া রুক্ষ চুলের গোছা দু-এক গাছা সর্বজয়ার হাতে থাকিয়া গেল।

অপু খাইতে খাইতে অবাক হইয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। দিদি পুঁতির মালা চুরি করিয়া আনিয়াছিল কিনা তাহা সে জানে না—পুঁতির মালাটা সে ইহার আগে কোনও দিনও দেখে নাই—কিন্তু আমের গুটি যে চুরির জিনিস নয় তাহা সে নিজে জানে। কাল বৈকালে দিদি তাহাকে সঙ্গে করিয়া টুনুদের বাগানে আম কুড়াইতে গিয়াছিল এবং সোনামুখীর তলায় আম কটা পড়িয়াছিল, দিদি কুড়াইয়া লইল, সে জানে। কাল হইতে অনেকবার দিদি বলিয়াছে, —ও অপু, এবার সেই আমের গুটিগুলো জারাব, কেমন তো! কিন্তু মা অসুবিধাজনকভাবে বাড়ি উপস্থিত থাকার দরুন উক্ত প্রস্তাব আর কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। দিদির অত্যন্ত আশার জিনিস আমগুলো এভাবে লইয়া গেল, তাহার উপর আবার দিদি এরূপ ভাবে মারও খাইল। দিদির চুল ছিঁড়িয়া দেওয়ায় মায়ের উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। যখন তাহার দিদির মাথার সামনে রুক্ষ চুলের এক গোছা খাড়া হইয়া বাতাসে উড়ে—তখনই কী জানি কেন, দিদির উপর অত্যন্ত মমতা হয়—কেমন যেন মনে হয়, দিদির কেহ কোথাও নাই—সে যেন একা কোথা হইতে আসিয়াছে—উহার সাথি কেহ এখানে নাই। কেবলই মনে হয়, কেমন করিয়া সে দিদির সকল দুঃখ ঘুচাইয়া দিবে—সকল অভাব পূরণ করিয়া তুলিবে। তাহার দিদিকে সে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না।

খাওয়ার পরে অপু মায়ের ভয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার মন থাকিয়া থাকিয়া কেবলই বাহিরে ছুটিয়া যাইতেছিল। বেলা একটু পড়িলে সে টুনুদের বাড়ি, পটলিদের বাড়ি, নেড়াদের বাড়ি—একে একে সকল বাড়ি খুঁজিল—দিদি কোথাও নাই। রাজকৃষ্ট পালিতের স্ত্রী ঘাট হইতে জল লইয়া আসিতেছিলেন—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—জেঠিমা, আমার দিদিকে দেখেচো? সে আজ ভাত খায়নি,—কিচ্ছু খায়নি —মা তাকে আজ বড্ড মেরেচে—মার খেয়ে কোথায় পালিয়েচে দেখেচো জেঠিমা?

বাড়ির পাশের পথ দিয়া যাইতে যাইতে ভাবিল—বাঁশবাগানে সে যদি বসিয়া থাকে? সেদিকে গিয়া সমস্ত খুঁজিয়া দেখিল। সে খিড়কি-দরজা দিয়া বাড়ি ঢুকিয়া দেখিল বাড়িতে কেহ নাই! তাহার মা বোধহয় ঘাটে কি অন্য কোথাও গিয়াছে। বাড়িতে বৈকালের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে। সম্মুখের দরজার কাছে যে বাঁশঝাড় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার একগাছা ঝুলিয়া-পড়া শুকনো কঞ্চিতে তাহার পরিচিত সেই লেজঝোলা হলদে পাখিটা আসিয়া বসিয়াছে। রোজই সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সে কোথা হইতে আসিয়া এই বাঁশঝাড়ের ওই কঞ্চিখানার উপর বসে—রোজ—রোজ—রোজ। আরও কত কী পাখি চারিদিকের বনে কিচ কিচ করিতেছে। নীলমণি রায়েদের পোড়ো ভিটা গাছপালার ঘন ছায়ায় ভরিয়া গিয়াছে। তাহার মন হঠাৎ হু হু করিয়া উঠিল। কতক্ষণ হইল, সেই গিয়াছে, বাড়ি আসে নাই, খায় নাই—কোথায় গেল দিদি?

ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির ছেলেমেয়েরা মিলিয়া উঠানে ছুটাছুটি করিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে। রানু তাহাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল—ভাই, অপু এসেচে...ও আমাদের দিকে হবে, আয়রে অপু।

অপু তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি খেলব না রানুদি—দিদিকে দেখেচো?

রানু জিজ্ঞাসা করিল—দুগ্‌গা? না, তাকে তো দেখিনি! বকুলতলায় নেই তো?

বকুলতলার কথা তাহার মনেই হয় নাই। সেখানে দুর্গা প্রায়ই থাকে বটে! ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি হইতে সে বকুলতলায় গেল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—বকুলগাছটা অনেক দূর পর্যন্ত জুড়িয়া ডালপালা ছড়াইয়া ঝুপসি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তলাটা অন্ধকার। কেহ কোথাও নাই, ...যদি কোনোদিকে গাছপালার আড়ালে থাকে! সে ডাক দিল—দিদি, ও দিদি! দিদি?

অন্ধকার গাছটায় কেবল কতকগুলা বক পাখা ঝটপট করিতেছে মাত্র। অপু ভয়ে ভয়ে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল। বকুলতলি হইতে একটু দূরে ডোবার ধারে খেজুর গাছ আছে, এখন ডাঁশা খেজুরের সময়, সেখানেও তাহার দিদি মাঝে মাঝে থাকে বটে। কিন্তু অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, ডোবাটার দুই ধারে বাঁশবন, সেখানে যাইয়া দেখিতে তাহার সাহস হইল না। বকুলগাছের গুঁড়ির কাছে সরিয়া গিয়া সে দুই-একবার চিৎকার করিয়া ডাকিল—ভাঁটশেওড়া বনে কী একটা জন্তু তাহার গলার সাড়া পাইয়া খস খস শব্দ করিয়া ডোবার দিকে পলাইল।

বাড়ির পথে ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সামনে সেই গাব গাছটা! একা সন্ধ্যার পর এ গাবগাছের তলার পথ দিয়া যাওয়া! সর্বনাশ! গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। কেন যে তাহার এই গাছটির নীচে দিয়া যাইতে ভয় করে, তাহা সে জানে না। কোনো কারণ নাই, এমনিই ভয় করে এবং কারণ কিছু নাই বলিয়া ভয় অত্যন্ত বেশি করে।

অপু খানিকক্ষণ অন্ধকার গাবতলাটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিল। তাহাদের বাড়ি যাইবার আর একটি পথ আছে—একটুখানি ঘুরিয়া পট্‌লিদের বাড়ির উঠান দিয়া গেলে গাবতলার এ অজানা বিভীষিকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। পট্‌লির ঠাকুরমা সন্ধ্যার সময় বাড়ির রোয়াকে ছেলেপিলেদের লইয়া হাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতেছেন। পট্‌লির মা রান্নাঘরে রাঁধিতেছেন উঠানের মাচাতলায় বিধু জেলেনি দাঁড়াইয়া মাছ বিক্রয়ের পয়সা তাগাদা করিতেছে।

অপু বলিল — দিদিকে খুঁজতে গিয়েছিলাম ঠাকুমা — বকুলতলা থেকে আসতে আসতে —

ঠাকুমা বলিলেন — দুগ্‌গা এই তো বাড়ি গেল। এই কতক্ষণ যাচ্ছে — ছুটে যা দিকি — বোধহয় এখনও বাড়ি গিয়ে পৌঁছায়নি —

সে এক দৌড়ে বাড়ির দিকে ছুটিল। পিছন হইতে পট্‌লির বোন রাজী চেঁচাইয়া বলিল — কাল সকালে আসিস অপু — আমরা গঙ্গা-যমুনা খেলার নতুন ঘর কেটেছি। ঢেঁকশালের পেছনে নিমতলায় — দুগ্‌গাকে বলিস —

তাহাদের বাড়ির কাছে আসিয়া পৌঁছিয়া হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল — দুর্গা আর্তস্বরে চিৎকার করিতে করিতে বাড়ির দরজা দিয়া দৌড়াইয়া বাহির হইতেছে — পিছনে পিছনে তাহার মা কী একটা হাতে মারিতে মারিতে তাড়া করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

দুর্গা গাবতলার পথ দিয়া ছুটিয়া পলাইল, মা দরজা হইতে ধাবমানা মেয়ের পিছনে চেঁচাইয়া বলিল — যাও, বেরোও — একেবারে জন্মের মতো যাও — আর কক্ষনো বাড়ি যেন ঢুকতে না হয় — বালাই, আপদ চুকে যাক — একেবারে ছাতিমতলায় দিয়ে আসি।

ছাতিমতলায় গ্রামের শ্মশান। অপুর সমস্ত শরীর যেন জমিয়া পাথরের মতো আড়ষ্ট ও ভারী হইয়া গেল। তাহার মা সবেমাত্র ভিতরের বাড়িতে ঢুকিয়া মাটির প্রদীপটি রোয়াকের ধার হইতে উঠাইয়া লইতেছে। সে পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ি ঢুকিতেছে তাহার মা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল — তুমি আবার এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে শুনি? মোটে তো আজ ভাত খেয়েচো!

তাহার মনে নানা প্রশ্ন জাগিতেছিল। দিদি আবার মার খাইল কেন? সে এতক্ষণ কোথায় ছিল? দুপুরবেলা দিদি কী খাইল? সে কী আবার কোনো জিনিস চুরি করিয়া আনিয়াছে? কিন্তু ভয়ে কোনো কথা না বলিয়া সে কলের পুতুলের মতো মায়ের কথা মতো কাজ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। পরে ভয়ে ভয়ে প্রদীপ উসকাইয়া নিজের ছোটো বইয়ের দপ্তরটি বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। সে পড়ে মোটে তৃতীয় ভাগ — কিন্তু দপ্তরে দু-খানা মোটা ভারী ইংরাজি কী বই, কবিরাজি ঔষধের তালিকা, একখানি পাতা-ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালি, একখানি ১৩০৩ সালের পুরাতন পাঁজি প্রভৃতি আছে। সে নানাস্থান হইতে চাহিয়া এগুলি জোগাড় করিয়াছে এবং এগুলি না পড়িতে পারিলেও রোজ একবার করিয়া খুলিয়া দেখে।

খানিকক্ষণ দেয়ালের দিকে চাহিয়া সে কী ভাবিল। পরে আর একবার প্রদীপ উসকাইয়া দিয়া পাতা-ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালিখানি খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে পাতা উলটাইতেছে, এমন সময়ে সর্বজয়া একবাটি দুধ হাতে করিয়া ঢুকিয়া বলিল, — এসো, খেয়ে নাও দিকি!

অপু দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটি উঠাইয়া দুধ চুমুক দিয়া খাইতে লাগিল। অন্যদিন হইলে এত সহজে দুধ খাইতে তাহাকে রাজি করানো খুব কঠিন হইত। একটুখানি মাত্র খাইয়া সে বাটি মুখ হইতে নামাইল। সর্বজয়া বলিল — ওকি? নাও সবটুকু খেয়ে ফেলো — ওইটুকু দুধ ফেললে তবে বাঁচবে কী খেয়ে —

অপু বিনা প্রতিবাদে দুধের বাটি পুনরায় মুখে উঠাইল। সর্বজয়া দেখিল সে মুখে বাটি ধরিয়া রহিয়াছে

কিন্তু চুমুক দিতেছে না — তাহার বাটিসুদ্ধ হাতটি কাঁপিতেছে ... পরে অনেকক্ষণ মুখে ধরিয়া রাখিয়া হঠাৎ বাটি নামাইয়া সে মায়ের দিকে চাহিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। সর্বজয়া আশ্চর্য হইয়া বলিল — কী হলো রে? কী হয়েচে, জিভ কামড়ে ফেলেছিস?

অপু মায়ের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের বাঁধ না মানিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল — দিদির জন্য বড্ড মন কেমন করছে!...

সর্বজয়া অল্পক্ষণ মাত্র চুপ করিয়া বসিয়া পরে সরিয়া আসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শান্তসুরে বলিতে লাগিল — কেঁদো না, অমন করে কেঁদো না, — ওই পটলিদের কী নেড়াদের বাড়ি বসে আছে — কোথায় যাবে অন্ধকারে? কম দুষ্টু মেয়ে নাকি? সেই দুপুরবেলা বেরুল — সমস্ত দিনের মধ্যে আর চুলের টিকি দেখা গেল না — না খাওয়া, না দাওয়া, কোথায় ও পাড়ার পালিতদের বাগানে বসে ছিল, সেখানে বসে কাঁচা আম আর জামরুল খেয়েছে, এক্ষুনি ডাকতে পাঠাচ্ছি — কেঁদো না অমন করে।

পরে সে আঁচল দিয়া ছেলের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বাকি দুধটুকু খাওয়াইবার জন্য বাটি তাহার মুখে তুলিয়া ধরিল — হাঁ করো দিকি, লক্ষ্মী সোনা, উনি এলেই ডেকে আনবেন এখন — একেবারে পাগল — কোত্থেকে একটা পাগল এসে জন্মেছে — আর এক চুমুক — হ্যাঁ —

রাত অনেক হইয়াছে। উত্তরের ঘরের তক্তাপোশে অপু ও দুর্গা শুইয়া আছে। অপুর পাশে তাহার মায়ের শুইবার জায়গা খালি আছে। কারণ মা এখনও রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসে নাই। তাহার বাবা আহারাদি সারিয়া পাশের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। বাবা বাড়ি আসিয়া দুর্গাকে পাড়া হইতে খুঁজিয়া আনিয়াছেন।

বাড়ি আসিয়া পর্যন্ত দুর্গা কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলে নাই। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছে। অপু দুর্গার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল — দিদি, মা কী দিয়ে মেরেছিল রে সন্ধেবেলা? তোর চুল ছিঁড়ে দিয়েচে? —

দুর্গার মুখে কোনো কথা নাই।

সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল — আমার উপর রাগ করেচিস দিদি? আমি তো কিছু করিনি।

দুর্গা আস্তে আস্তে বলিল — না বইকি! তবে সতু কী করে টের পেল যে পুঁতির মালা আমার বাক্সে আছে?

অপু প্রতিবাদের উত্তেজনায় উঠিয়া বসিল। না — সত্যি — আমি তোর গা ছুঁয়ে বলচি দিদি, আমি তো দেখাইনি। আমি জানিনে যে তোর বাক্সে আছে — কাল সতু বিকেলবেলা এসেছিল, ওর সেই বড়ো রাঙা ভাঁটাটা নিয়ে আমরা খেলছিলাম — তারপর, বুঝলি দিদি, সতু তোর পুতুলের বাক্স খুলে কী দেখছিল — আমি বল্লাম, ভাই, তুমি দিদির বাক্সে হাত দিয়ো না — দিদি আমাকে বকে — সেইসময়ে দেখেচে —

পরে সে দুর্গার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল — খুব লেগেচে রে দিদি? কোথায় মেরেচে মা?

দুর্গা বলিল — আমার কানের পাশে মা একটা বাড়ি যা মেরেচে — রক্ত বেরিয়েছিল, এখনও কন্ কন্ কচ্ছে, এইখানে এই দ্যাখ হাত দিয়ে! এই —

এইখানে? তাই তো রে! কেটে গিয়েছে যে? একটু পিদিমের তেল লাগিয়ে দেবো দিদি?

থাকগে — কাল পালিতদের বাগানে বিকেলবেলা যাব বুঝলি? কামরাঙা যা পেকেছে! এই এত বড়ো বড়ো, কাউকে যেন বলিসনে! তুই আর আমি চুপি চুপি যাব — আমি আজ দুপুরবেলা দুটো পেড়ে খেয়েছি — মিষ্টি যেন গুড় —

৫

এদিনের ব্যাপারটি এইরূপে ঘটিল।

অপু বাবার আদেশে তালপাতায় সাতখানা ক খ হাতের লেখা শেষ করিয়া কী করা যায় ভাবিতে ভাবিতে বাড়ির মধ্যে দিদিকে খুঁজিতে গেল। দুর্গা মায়ের ভয়ে সকালে নাহিয়া আসিয়া ভিতরের উঠানের পেঁপেতলায় পুণ্যিপুকুরের ব্রত করিতেছে। উঠানে ছোট্ট চৌকোণা গর্ত কাটিয়া তাহার চারিধারে ছোলা, মটর ছড়াইয়া দিয়াছিল — ভিজা মাটিতে সেগুলির অঙ্কুর বাহির হইয়াছে — চারিদিকে কলার ছোটো বোগ পুঁতিয়া ধারে পিটুলিগোলার আলপনা দিতেছে — পদ্মলতা, পাখি, ধানের শিষ, নতুন ওঠা সূর্য। দুর্গা বলিল, দাঁড়া, মন্তরটা বলে চল এক জায়গায় যাব।

— কোথা রে, দিদি —

— চল না, নিয়ে যাব এখন, দেখিস এখন —। পরে আনুষঙ্গিক বিধি-অনুষ্ঠান সাঙ্গ করিয়া সে এক নিশ্বাসে আবৃত্তি করিতে লাগিল —

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পূজে রে দুপুরবেলা?
আমি সতী লীলাবতী ভায়ের বোন ভাগ্যবতী —

ব্রতানুষ্ঠান শেষ করিয়া দুর্গা বলিল, চল গড়ের পুকুরে অনেক পানফল হয়ে আছে — ভোঁদার মা বলছিল, চল নিয়ে আসি —

কোনকালে গ্রামের আদি বাসিন্দা মজুমদারের বাড়ির চতুর্দিকে যে গড়খাই ছিল তাহার অন্য অংশ এখন ভরাট হইয়া গিয়াছে — কেবল এইখানটিতে বারোমাস জল থাকে, ইহারই নাম গড়ের পুকুর।

সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল পুকুরে পানফল অনেক আছে বটে, কিন্তু কিনারার ধারে বিশেষ কিছু নাই, সবই জল হইতে দূরে। দুর্গা বলিল — অপু, একটা বাঁশের কঞ্চি দ্যাখ তো খুঁজে — তাই দিয়ে টেনে টেনে আনব। পরে সে পুকুরধারের ঝোপের শেওড়াগাছ হইতে পাকা শেওড়ার ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল। অপু বনের মধ্যে কঞ্চি খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইয়া বলিল — ও দিদি, ও ফল খাসনি! — দূর — আশ শ্যাওড়ার ফল কি খায়রে? ও তো পাখিতে খায় —

দুর্গা পাকা ফল টিপিয়া বীজ বাহির করিতে করিতে বলিল — আয় দিকি — দ্যাখ দিকি খেয়ে — মিষ্টি যেন গুড় — কে বলেচে খায় না? আমি তো কত খেইচি।

অপু কঞ্চি কুড়ানো রাখিয়া দিদির কাছে আসিয়া বলিল — খেলে যে বলে পাগল হয়? আমায় একটা দে দিকি, দিদি —

পরে সে খাইয়া মুখ একটু কাঁচুমাচু করিয়া বলিল — এট্টু এট্টু তেতো যে দিদি —

— তা এট্টু তেতো থাকবে না? তা থাক, কেমন মিষ্টি বল দিকি — কথা শেষ করিয়া দুর্গা খুব খুশির সহিত গোটাকতক পাকা ফল মুখের মধ্যে পুরিল।

জন্মিয়া পর্যন্ত ইহারা কখনও কোনো ভালো জিনিস খাইতে পায় নাই। অথচ পৃথিবীতে ইহারা নূতন আসিয়াছে, জিহ্বা ইহাদের নূতন — তাহা পৃথিবীর নানা রস, বিশেষত মিষ্ট রস আস্বাদ করিবার জন্য লালায়িত। সন্দেশ মিঠাই কিনিয়া সে পরিতৃপ্তি লাভ করিবার সুযোগ ইহাদের ঘটে না — বিশ্বের অনন্ত সম্পদের মধ্যে তুচ্ছ বনগাছ হইতে মিষ্টরস আহরণরত এইসব লুব্ধ দরিদ্র ঘরের বালকবালিকাদের জন্য তাই করুণাময়ী বনদেবীরা বনের তুচ্ছ ফুলফল মধুতে ভরাইয়া রাখেন।

ভাইবোনের কলহাস্যে খানিকক্ষণ ধরিয়া পুকুরপ্রান্তের নির্জন বাঁশবাগান মুখরিত হইতে লাগিল।

খানিকটা পরে অপু পাশের একটি শেওড়াগাছের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল — দিদি দ্যাখ কী এখানে। তারপরে সে ছুটিয়া গিয়া মাটি খুঁড়িয়া কী তুলিতে লাগিল।

দুর্গা জিজ্ঞাসা করিল — কী রে? পরে সেও ভাইয়ের কাছে আসিল।

অপু ততক্ষণ মাটি খুঁড়িয়া কী একটি বাহির করিয়া কোঁচর কাপড় দিয়া মাটি মুছিয়া সাফ করিতেছে। হাতে করিয়া আহ্লাদের সহিত দিদিকে দেখাইয়া বলিল — দ্যাখ দিদি, চক্‌চক্ কচ্ছে — কী জিনিস রে?

দুর্গা হাতে লইয়া দেখিল — গোলমতো একদিকে ছুঁচোলো পল-কাটা-কাটা চক্‌চকে কী একটা জিনিস। সে খানিকক্ষণ আগ্রহের সহিত নানাভাবে উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ কী ভাবিয়া তাহার রুক্ষচুলে-ঘেরা মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ দেখিতেছে কিনা। চুপি চুপি বলিল — অপু, এটা বোধহয় হিরে! চুপ কর, চেঁচাসনে। পরে ভয়ে ভয়ে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

অপু দিদির দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। হীরক বস্তুটি তাহার অজ্ঞাত নয় বটে — মায়ের মুখে, দিদির মুখে রূপকথার রাজপুত্র রাজকন্যার হিরা-মুক্তার অলংকারের ঘটনা সে অনেকবার শুনিয়াছে; কিন্তু হিরা জিনিসটা কীরকম দেখিতে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে একটু ভুল ধারণা ছিল। তাহার মনে হইত হিরা দেখিতে মাছের ডিমের মতো, হলদে হলদে, তবে নরম নয় — শক্ত...

সর্বজয়া বাড়ি ছিল না, পাড়া হইতে আসিয়া দেখিল — ছেলেমেয়ে বাড়ির ভিতর দিকে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কাছে যাইতে দুর্গা চুপি চুপি বলিল — মা, একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েচি আমরা। গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিয়েছিলাম মা। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে এইটে পোঁতা ছিল!

অপু বলিল — আমি দেখে দিদিকে বল্লাম, মা।

দুর্গা আঁচল হইতে জিনিসটা খুলিয়া মায়ের হাতে দিয়া বলিল — দেখো দিকি কী এটা মা? — এটা ঠিক হিরে — নয়?

সর্বজয়ারও হীরক সম্বন্ধে ধারণা তাহাদের অপেক্ষা বেশি স্পষ্ট নহে। সে সন্দিগ্ধসুরে জিজ্ঞাসা

করিল — তুই কী করে জানলি হিরে?

দুর্গা বলিল — মজুমদারেরা বড়োলোক ছিল তো মা? ওদের ভিটের জঙ্গলে কারা নাকি মোহর কুড়িয়ে পেয়েছিল। এটা একেবারে পুকুরের ধারে বনের মধ্যে পোঁতা ছিল, রোদ্দুর লেগে চক্‌চক্‌ কচ্ছিল, — এ ঠিক মা হিরে।

সর্বজয়া বলিল — আগে উনি আসুন, ওকে দেখাই।

দুর্গা বাহিরে উঠানে আসিয়া আহ্লাদের সহিত ভাইকে বলিল — হিরে যদি হয়, তবে দেখিস আমরা বড়োমানুষ হয়ে যাব।

অপু না বুঝিয়া বোকার মতো হি হি করিয়া হাসিল।

খানিকটা পরে একটা পুঁটুলি হাতে হরিহর বাড়ি ঢুকিল।

সর্বজয়া বলিল — ওগো, শোনো, এদিকে এসো তো! দেখো তো এটা কী?

হরিহর হাতে লইয়া বলিল — কোথায় পেলে?

— দুগ্‌গা গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিয়েছিল, কুড়িয়ে পেয়েছে। কী বলো দিকি?

হরিহর খানিকটা উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিয়া বলিল, — কাচ না হয়, পাথর-টাথর হবে — এতটুকু জিনিস, ঠিক বুঝতে পারচিনে।

সর্বজয়ার মনে একটুখানি ক্ষীণ আশার রেখা দেখা দিল — কাচ হইলে তাহার স্বামী কী চিনিতে পারিত না? পরে সে চুপিচুপি, যেন পাছে স্বামী বিরুদ্ধযুক্তি দেখায় এই ভয়ে বলিল — হিরে নয় তো? যদি হিরে হয়!

— হ্যাঁ, হিরে যদি পথেঘাটে পাওয়া যেত তবে আর ভাবনা কী ছিল? তুমিও যেমন !...

তাহার মনে মনে ধারণা হইল ইহা কাচ। পরক্ষণেই কিন্তু মনে হইল হয়তো হইতেও পারে। বলা যায় কী! মজুমদারেরা বড়োলোক ছিল। বিচিত্র কি যে হয়তো তাহাদেরই গহনায়-টহনায় কোনো কালে বসানো ছিল, কী করিয়া মাটির মধ্যে পুঁতিয়া গিয়াছে! কথায় বলে, কপালে না থাকিলে গুপ্তধন হাতে পড়িলেও চেনা যায় না — শেষে কি দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্পের মতো ঘটিবে?

সে বলিল — আচ্ছা দাঁড়াও, একবার বরং গাঙ্গুলিবাড়ি দেখিয়ে আসি।

রাঁধিতে রাঁধিতে সর্বজয়া বারবার মনে মনে বলিতে লাগিল — দোহাই ঠাকুর কত লোক তো কত কী কুড়িয়ে পায়। এই কষ্ট যাচ্ছে সংসারে — বাছাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ো — দোহাই ঠাকুর!

তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বাড়ি আসিয়া আগ্রহের সুরে বলিল — বাবা এখনও বাড়ি ফেরেনি, হ্যাঁ মা?

সঙ্গে সঙ্গে হরিহর বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া বলিল --- হুঁঃ, তখনই আমি বল্লাম এ কিছুই নয়। গাঙ্গুলিমশায়ের জামাই সত্যবাবু কলকাতা থেকে এসেছেন --- তিনি দেখে বল্লেন, একরকম বেলোয়ারি কাচ --- ঝাড়-লণ্ঠনে ঝুলোনো থাকে। রাস্তাঘাটে যদি হিরে-জহরত পাওয়া যেত তাহলে ... তুমিও যেমন!

৬

বৈকালের দিকটা হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল। অনেকক্ষণ হইতে মেঘ-মেঘ করিতেছিল, তবুও ঝড়টা যেন খুব শীঘ্র আসিয়া পড়িল। অপুদের বাড়ির সামনে বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলো পাঁচিলের উপর হইতে ঝড়ের বেগে হটিয়া ওধারে পড়াতে বাড়িটা যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতে লাগিল —ধুলা, বাঁশপাতা, কাঁঠালপাতা, খড়, চারিধার হইতে উড়িয়া তাহাদের উঠান ভরাইয়া ফেলিল। দুর্গা বাটীর বাহির হইয়া আম কুড়াইবার জন্য দৌড়িল— অপুও দিদির পিছু পিছু ছুটিল! দুর্গা ছুটিতে ছুটিতে বলিল--- শিগ্‌গির ছোট, তুই বরং সিঁদুরকৌটো-তলায় থাক, আমি যাই সোনামুখীতলায় —দৌড়ো—দৌড়ো। ধুলায় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—বড়ো বড়ো গাছের ডাল ঝড়ে বাঁকিয়া গাছ নেড়া নেড়া দেখাইতেছে! গাছে গাছে সোঁ সোঁ, বোঁ বোঁ শব্দে বাতাস বাধিতেছে — বাগানে শুকনা ডাল, কুটা, বাঁশের খোলা উড়িয়া পড়িতেছে— শুকনা বাঁশপাতা ছুঁচালো আগাটি উঁচুদিকে তুলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে উঠিতেছে—কুক্‌শিমা গাছের শুঁয়ার মতো পালকওলা সাদা সাদা ফুল ঝড়ের মুখে কোথা হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতেছে—বাতাসের শব্দে কান পাতা যায় না।

সোনামুখী-তলায় পৌঁছিয়াই অপু মহা-উৎসাহে চিৎকার করিতে করিতে লাফাইয়া এদিক-ওদিক ছুটিতে লাগিল – এই যে দিদি, ওই একটা পড়ল রে দিদি—ওই আর একটা রে দিদি! চিৎকার যতটা করিতে লাগিল তাহার অনুপাতে সে আম কুড়াইতে পারিল না। ঝড় ঘোর রবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ঝড়ের শব্দে আম পড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, যদি বা শোনা যায় ঠিক কোন জায়গা বরাবর শব্দটা হইল—তাহা ধরিতে পারা যায় না। দুর্গা আট-নয়টা আম কুড়াইয়া ফেলিল, অপু এতক্ষণের ছুটাছুটিতে মোটে পাইল দুইটা। তাহাই সে খুশির সহিত দেখাইয়া বলিত লাগিল—এই দ্যাখ দিদি, কত বড়ো দ্যাখ—ওই একটা পড়ল—ওই ওদিকে—

এমন সময় হই-হাই শব্দে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির ছেলেমেয়েরা সব আম কুড়াইতে আসিতেছে শোনা গেল। সতু চেঁচাইয়া বলিল— ও ভাই, দুগ্‌গাদি আর অপু আম কুড়ুচ্ছে—

দল আসিয়া সোনামুখী তলায় পৌঁছিল। সতু বলিল— আমাদের বাগানে কেন এয়েচ আম কুড়ুতে? সেদিন মা বারণ করে দিয়েচে না? দেখি কতগুলো আম কুড়িয়েচো?

পরে দলের দিকে চাহিয়া বলিল— সোনামুখীর কতগুলো আম কুড়িয়েচে দেখছিস টুনু? যাও আমাদের বাগান থেকে দুগ্‌গাদি— মাকে গিয়ে নইলে বলে দেব।

রানু বলিল— কেন তাড়িয়ে দিচ্ছিস সতু? ওরাও কুড়ুক —আমরাও কুড়ুই!

—কুড়োবে বই কী! ও এখানে থাকলে সব আম ওই নেবে। আমাদের বাগানে কেন আসবে ও? না, যাও দুগ্‌গাদি— আমাদের গাছের তলায় থাকতে দেব না।

অন্য সময় হইলে দুর্গা হয়তো সহজে পরাজয় স্বীকার করিত না— কিন্তু সেদিন ইহাদেরই কৃত অভিযোগে মায়ের নিকট মার খাইয়া তাহার পুনরায় বিবাদ বাধাইবার সাহস ছিল না। তাই খুব সহজেই পরাজয় স্বীকার করিয়া লইয়া সে একটু মনমরা ভাবে বলিল —অপু, আয়রে, চল্। পরে হঠাৎ মুখে কৃত্রিম উল্লাসের ভাব আনিয়া বলিল— আমরা সেই জায়গায় যাই চল অপু, এখানে থাকতে না দিলে বয়ে গেল —বুঝলি তো?—এখানকার চেয়েও বড়ো বড়ো আম—তুই আমি মজা করে কুড়োব এখন— চলে আয়— এবং এখানে এতক্ষণ ছিল বলিয়া একটি বৃহত্তর লাভ হইতে বঞ্চিত ছিল, চলিয়া যাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে শাপে বর হইল, সকলের সম্মুখে এইরূপভাব দেখাইয়া যেন অধিকতর উৎসাহের সহিত অপুকে পিছনে লইয়া রাংচিতার বেড়ার ফাঁক গলিয়া বাগানের বাহির হইয়া গেল।

রানু বলিল— কেন ভাই ওদের তাড়িয়ে দিলে— তুমি ভারি হিংসুক কিন্তু সতুদা! রানুর মনে দুর্গার চোখের ভরসাহারা চাহনি বড়ো ঘা দিল।

অপু অতশত বোঝে নাই, বেড়ার বাহিরের পথে আসিয়া বলিল—কোন জায়গায় বড়ো বড়ো আম রে দিদি? পুঁটুদের সলতে-খাগি তলায়?

কোন তলায় দুর্গা তাহা ঠিক করে নাই, একটু ভাবিয়া বলিল— চল। গড়ের পুকুরের ধারের বাগানে যাবি— ওদিকে সব বড়ো বড়ো গাছ আছে— চল।

গড়ের পুকুর এখান হইতে প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া সুঁড়ি পথে অনবরত বন-বাগান অতিক্রম করিয়া তবে পৌঁছানো যায়। অনেক কালের প্রাচীন আম ও কাঁঠালের গাছ— গাছতলার বন-চালতা ময়না-কাঁটা ঝাঁড়া গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। দূর বলিয়া এবং জনপ্রাণীর বাসশূন্য গভীর বনের মধ্যে বলিয়া এসব স্থানে কেহ বড়ো একটা আম কুড়াইতে আসে না। কাছির মতো মোটা মোটা অনেক কালের পুরোনো গুলঞ্চ লতা এ গাছে ও গাছে দুলিতেছে— বড়ো বড়ো প্রাচীন গাছের তলাকার কাঁটাভরা ঘন ঝোপজঙ্গল খুঁজিয়া তলায় পড়া আম বাহির করা সহজসাধ্য তো নহেই, তাহার উপর আবার ঘনায়মান নিবিড়-কৃষ্ণ ঝোড়ো মেঘে ও বাগানের মধ্যের জঙ্গলে এরূপ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে যে, কোথায় কী ভালো দেখা যায় না। তবুও খুঁজিতে খুঁজিতে নাছোড়বান্দা দুর্গা গোটা আট-দশ আম পাইল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল— ওরে অপু—বিষ্টি এল!

সঙ্গে সঙ্গে ঝড়টি যেন খানিকক্ষণ একটু নরম হইল— ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাওয়া গেল— একটু পরেই মোটা মোটা ফোঁটায় চড়বড় করিয়া গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিল।

দেখিতে দেখিতে চারিদিক ধোঁয়াকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল—বৃষ্টির ফোঁটা পড়িবার জোরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল— ভরপুর টাটকা ভিজা মাটির গন্ধ আসিতে লাগিল। ঝড় একটু যেন নরম হইয়া পড়িয়াছিল— তাহাও আবার বড়ো বাড়িল— দুর্গা যে গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল, এমনি হয়তো হঠাৎ তথায় বৃষ্টি পড়িত না, কিন্তু পুবে হাওয়ার ঝাপটা গাছতলা ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বাড়ি হইতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে—অপু ভয়ের স্বরে বলিল—ও দিদি— বড্ড যে বিষ্টি এল!

— তুই আমার কাছে আয়— দুর্গা তাহাকে কাছে আনিয়া, আঁচল দিয়া ঢাকিয়া কহিল— এ বিষ্টি

আর কতক্ষণ হবে— এই ধরে গেল বলে— বিষ্টি হলো ভালোই হলো— আমরা আবার সোনামুখী তলায় যাব এখন, কেমন তো?

দুজনে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—

নেবুর পাতায় করমচা,

হে বিষ্টি ধরে যা—

কড়—কড়—কড়াৎ... প্রকাণ্ড বন বাগানের অন্ধকার মাথাটা যেন এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত চিরিয়া গেল— চোখের পলকের জন্য চারিধারে আলো হইয়া উঠিল—অপু দুর্গাকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল —ও দিদি!

ভয় কীরে! — নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বিষ্টি ধরে যা — নেবুর পাতায় করম্‌চা —

বৃষ্টির ঝাপটায় তাহাদের কাপড় চুল ভিজিয়া টস্‌টস্‌ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। চারিদিকে শুধু মুষলধারে বৃষ্টিপতনের হুস-স-স-স একটানা শব্দ, মেঘের ডাকে কানে তালা ধরিয়া যায়। এক একবার দুর্গার মনে হইতেছিল সমস্ত বাগানখানা ঝড়ে মড়মড় করিয়া উপুড় হইয়া তাহাদের চাপা দিল বুঝি!

ক্কড়—ক্কড়—কড়াৎ

অপু ভয়ে চোখ বুজিল।

দুর্গা শুষ্ক গলায় উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল,— বাজ পড়িতেছে না কি! গাছের মাথায় বন ধুঁধুলের ফল দুলিতেছে।

শীতে অপুর ঠকঠক করিয়া দাঁতে দাঁত লাগিতেছিল—দুর্গা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া

শেষ আশ্রয়ের সাহসে বারবার দ্রুত আবৃত্তি করিতে লাগিল— নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বিষ্টি ধরে যা— নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বিষ্টি ধরে যা— নেবুর পাতায় করম্‌চা.... ভয়ে তাহার স্বর কাঁপিতেছিল।

সন্ধ্যা হইবার বেশি বিলম্ব নাই। ঝড়-বৃষ্টি খানিকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। পথে জমিয়া যাওয়া বৃষ্টির জলের উপর ছপ ছপ শব্দ করিতে করিতে রাজকৃষ্ণ পালিতের মেয়ে আশালতা পুকুরের ঘাটে যাইতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল— হ্যাঁ মা, দুর্গা আর অপুকে দেখেছিস ওদিকে?

আশালতা বলিল— না খুড়িমা, দেখিনি তো। কোথায় গিয়েচে? তারপর হাসিয়া বলিল— কি ব্যাং-ডাকানি জল হয়ে গেল খুড়িমা!

—সেই ঝড়ের আগে দুজন বেরিয়েচে আম কুড়োতে যাই বলে, আর তো ফেরেনি —এই ঝড় বৃষ্টি গেল, সন্দে হলো, ও মা কোথায় গেল তবে?

সর্বজয়া উদ্‌বিগ্ন মনে বাড়ির মধ্যে ফিরিয়া আসিল। কী করিবে ভাবিতেছে এমন সময় খিড়কির দরজা ঠেলিয়া আপাদমস্তক সিক্ত অবস্থায় দুর্গা আগে আগে একটা ঝুনা নারিকেল হাতে ও পিছনে অপু একটা নারিকেলের বাগলো টানিয়া লইয়া বাড়ি ঢুকিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি ছেলে-মেয়ের কাছে গিয়া বলিল— ও

মা আমার কি হবে! ভিজে যে সব একেবারে পান্তাভাত হইচিস। পরে আহ্লাদের সহিত বলিল— নারকেল কোথা পেলি রে দুর্গা? কোথায় ছিলি বিষ্টির সময়?

অপু ও দুর্গা দুজনেই চাপা কণ্ঠে বলিল— চুপ চুপ মা— সেজজেঠিমা বাগানে যাচ্ছে— এই গেল— ওদের বাগানের বেড়ার ধারের দিকে যে নারকোল গাছটা ওর তলায় পড়ে ছিল। আমরাও বেরুচ্চি সেজজেঠিমাও ঢুকল।

দুর্গা বলিল— অপুকে তো ঠিক দেখেচে— আমাকেও বোধহয় দেখেচে। পরে সে উৎসাহের সঙ্গে অথচ চাপা সুরে বলিতে লাগিল—একেবারে গাছের গোড়ায় পড়ে ছিল মা, আগে আমি টের পাইনি, সোনামুখী তলায় যদি আম পড়ে থাকে তাই দেখতে গিয়ে দেখি বাগলোটা পড়ে রয়েচে। অপুকে বললাম— অপু বাগলোটা নে— মার ঝাঁটার কষ্ট, ঝাঁটা হবে। তারপরই দেখি, — হস্তস্থিত নারিকেলটার দিকে উজ্জ্বল মুখে চাহিয়া বলিল—বেশ বড়ো না মা?

অপু খুশির সুরে হাত নাড়িয়া বলিল— আমি অমনি বাগলোটা নিয়ে ছুট—

সর্বজয়া বলিল—বেশ বড়ো দোমালা নারকেলটা। ছেঁচতলায় রেখে দে, জল দিয়ে নেব—

অপু অনুযোগের সুরে বলিল—তুমি বলো মা নারকোল নেই, নারকোল নেই,— এই তো হলো নারকোল! এইবার কিন্তু বড়া করে দিতে হবে! আমি ছাড়ব না — কখ্‌খনো—

বৃষ্টির জলে ছেলেমেয়ের মুখ বৃষ্টিধোয়া জুঁই ফুলের মতো সুন্দর দেখাইতেছিল। ঠান্ডায় তাহাদের ঠোঁট নীল হইয়া গিয়াছে, মাথার চুল ভিজিয়া কানের সঙ্গে লেপটাইয়া লাগিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বলিল—আয় সব, কাপড় ছাড়িয়ে দিই আগে, পায়ে জল দিয়ে রোয়াকে ওঠ সব—

খানিক পরে সর্বজয়া কুয়ার জল তুলিতে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি গেল। ভুবন মুখুজ্যের খিড়কি-দোর পর্যন্ত যাইতেই সে শুনিল — সেজঠাকরুন বাড়ির মধ্যে চিৎকার করিয়া বাড়ি মাথায় করিতেছেন।

—একটা মুঠো টাকা খরচ করে তবে বাগান নেওয়া— মাগনা তো নয়। তার কোনো কুটোটা যদি হাঘরেদের জন্যে ঘরে ঢুকবার জো আছে। ওই ছুঁড়িটা রাদ্দিন বাগানে বসে আছে, কুটোগাছটা নিয়ে গিয়ে ঘরে তুলবে—ওমা, ভাবলাম বিষ্টি থেমেচে, যাই একবার বাগানটা গিয়ে দেখে আসি— এই এত বড়ো নারকোলটা কুড়িয়ে নিয়ে একেবারে দুড় দুড় দৌড়!— এত শত্তুরতা যেন ভগবান সহ্যি না করেন—উচ্ছন্ন যান, উচ্ছন্ন যান,—এই ভর সন্দেবেলা বলচি, আর যেন নারকোল খেতে না হয়—একবার শিগগির যেন ছাতিমতলা-সই হন—

সর্বজয়া খিড়কির বাহিরে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলেমেয়ের বর্ষণসিক্ত কচিমুখ মনে করিয়া সে ভাবিল যদি গালাগাল ওদের লাগে! বাবা—যে লোক! দাঁতে বিষ আছে! কী করি? কথাটা ভাবিতেই তাহার গা শিহরিয়া উঠিয়া সর্বশরীর যেন অবশ হইয়া গেল। সে আর মুখুজ্যেবাড়ি ঢুকিল না।

ভয়ে ভয়ে সে জল তুলিবার ছোট্ট বালতিটা ও ঘড়া কাঁখে লইয়া বাড়ির দিকে ফিরিল।

পথে আসিতে আসিতে ভাবিল— যদি নারকোলটা ওদের ফেরত দিই— তাহলেও কি গাল লাগবে?

তা কেন লাগবে— যার জিনিস তাকে তো ফেরত দেওয়া হলো, তা কখনও লাগে?

বাড়িতে পা দিয়াই মেয়েকে বলিল— দুগ্‌গা, নারকোলটা সতুদের বাড়ি দিয়ে আয় গিয়ে।

অপু ও দুর্গা অবাক হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—

দুর্গা বলিল— এখ্‌খুনি?

—হ্যাঁ,—এখ্‌খুনি দিয়ে আয়। ওদের খিড়কির দোর খোলা আছে। চট করে যা। বলে আয়, আমরা কুড়িয়ে পেইছিলাম, এই নাও দিয়ে গেলাম।

—অপু আমাকে একটু দাঁড়াবে না, মা? বড্ড অন্ধকার হয়েচে, চল অপু আমার সঙ্গে।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে সর্বজয়া তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে দিতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ঠাকুর, নারকোল ওরা শত্তুরতা করে কুড়োতে যায়নি সে তো তুমি জানো, এ গাল যেন ওদের না লাগে। দোহাই ঠাকুর, ওদের তুমি বাঁচিয়ে-বর্তে রেখো ঠাকুর। ওদের তুমি মঙ্গল কোরো। তুমি ওদের মুখের দিকে চেয়ো। দোহাই ঠাকুর।

৭

গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়িতে একখানা মুদির দোকান করিতেন এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না! তবে এই বেতের উপর অভিভাবকদেরও বিশ্বাস গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা কিছু কম নয়।

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়ে রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়াছিল, মা আসিয়া ডাকিল— অপু, ওঠো শিগগির করে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে! কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেট। হ্যাঁ ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্য-নিদ্রোত্থিত চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁহার ধারণা ছিল যে যাহারা দুষ্টু ছেলে, মার কথা শোনে না, ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে তো কোনোদিন ওরূপ করে না, তবে সে কেন পাঠশালায় যাইবে?

খানিক পরে সর্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল—ওঠো অপু, মুখ ধুয়ে নাও, তোমায় অনেক করে মুড়ি বেঁধে দেবো এখন, পাঠশালায় বসে বসে খেয়ো এখন, ওঠো লক্ষ্মী মানিক!

মায়ের কথার উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল—ইঃ! পরে মায়ের দিকে চাহিয়া জিভ বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া এক প্রকার মুখভঙ্গি করিয়া রহিল, উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশি জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মার প্রতি

অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল, খাবার বাঁধিয়া দিবার সময় বলিল— আমি কখ্খনো আর বাড়ি আসচিনে দেখো!

—ষাট ষাট,বাড়ি আসবিনে কি! ওকথা বলতে নেই, ছিঃ! পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খইয়া বলিল—খুব বিদ্যে হোক, ভালো করে লেখাপড়া শিখো, তখন দেখবে তুমি কত বড়ো চাকরি করবে, কত টাকা হবে তোমার, কোনো ভয় নেই! ওগো, তুমি গুরুমশায়কে বলে দিয়ো যেন ওকে কিছু বলে না।

পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—ছুটি হবার সময়ে আমি আবার এসে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব অপু, বসে বসে লেখো, গুরুমশায়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি কোরো না যেন! খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অকূল সমুদ্র! সে অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড়ো বড়ো ছেলে আপন আপন চাটাই-এ বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কী পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোটো একটি ছেলে খুঁটিতে ঠেস দিয়া আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুড়িয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড়ো ছেলে তাহার গালে একটা আঁচিল, সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কী লক্ষ করিতেছে। তাহার সামনে দুজন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কী করিতেছিল। একজন চুপিচুপি বলিতেছিল , আমি এই ঢ্যারা দিলাম, অন্য ছেলেটি বলিতেছিল, এই আমার গোল্লা, সঙ্গে সঙ্গে তার শ্লেটে আঁক পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আড়চোখে বিক্রয়রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

অপু নিজের শ্লেটে বড়ো বড়ো করিয়া বানান লিখিতে লাগিল! কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন— এই ফনে, শ্লেটে ওসব কী হচ্ছে রে? সম্মুখের সেই ছেলে দুটি অমনি শ্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল, কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড়ো শক্ত, তিনি বলিলেন, এই সতে ফনের শ্লেটটা নিয়ে আয় তো! তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে বড়ো আঁচিলওয়ালা ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।

—হুঁ, এসব কী লেখা হচ্ছে শ্লেটে?— সতে ধরে নিয়ে আয় তো দুজনকে, কান ধরে নিয়ে আয়!

যেভাবে বড়ো ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল, এবং যেভাবে বিপন্নমুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরুমহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড়ো হাসি পাইল, সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয় বলিলেন, হাসে কে? হাসচো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা? অ্যাঁ? এটা নাট্যশালা নাকি?

নাট্যশালা কী, অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

—সতে, একখানা থান ইট নিয়ে আয় তো তেঁতুলতলা থেকে বেশ বড়ো দেখে?

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া গেল, কিন্তু ইট আনীত হইলে সে

দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ওই ছেলে দুটির জন্য। বয়স অল্প বলিয়াই হউক বা নতুন ভরতি বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সে যাত্রায় তাহাকে রেহাই দিলেন।

পাঠশালা বসিত বৈকালে। সবসুদ্ধ আট-দশটি ছেলেমেয়ে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ি হইতে ছোটো ছোটো মাদুর আনিয়া পাতিয়া বসে;অপুর মাদুর নাই, সে বাড়ি হইতে একখানা জীর্ণ কার্পেটের আসন আনে। যে ঘরটায় পাঠশালা হয়, তার কোনো দিকে বেড়া বা দেয়াল কিছু নাই; চারিদিকে খোলা, ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে। আট দশটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় দুলিয়া ও নানারূপ সুর করিয়া পড়া মুখস্থ করে।

গুরুমহাশয় একটা খুঁটিতে হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাই-এর উপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান-দেওয়ার অংশটি পাকিয়া গিয়াছে। বিকালবেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প-শোনা অপুর অনেক বেশি ভালো লাগিত। রাজু রায় মহাশয় প্রথম যৌবনে 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' স্মরণ করিয়া কীভাবে আষাঢ়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত। বেশ কেমন নিজের ছোট্ট দোকানের ঝাঁপটা তুলিয়া বসিয়া বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, হয়তো মাঝে মাঝে তাদের সেই মহাভারতখানা কী বাবার সেই দাশুরায়ের পাঁচালিখানা মাটির প্রদীপের সামনে খুলিয়া বসিয়া বসিয়া পড়া! বাহিরে অন্ধকারে বর্ষারাতে টিপটিপ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাং ডাকিতেছে—কী সুন্দর! বড়ো হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

এই গল্পগুজব এক এক দিন আবার ভাব ও কল্পনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠিত, গ্রামের ও পাড়ার রাজকৃষ্ণ সান্যাল মহাশয় যেদিন আসিতেন। যে-কোনো গল্প হউক, যত সামান্যই হউক না কেন, সেটি সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। সান্যাল মহাশয় দেশভ্রমণ-বাতিকগ্রস্ত ছিলেন। কোথায় দ্বারকা, কোথায় সাবিত্রী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ তাহা আবার একা দেখিয়া তাহার তৃপ্তি হইত না, প্রতিবারই স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাইতেন এবং খরচপত্র করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন। দিব্য আরামে নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থেলো হুঁকো টানিতেছেন, মনে হইতেছে, সান্যাল মহাশয়ের মতন নিতান্ত ঘরোয়া, সেকেলে, পাড়াগাঁয়ের প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত গৃহস্থ বুঝি বেশি আর নাই, পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, দরজায় তালাবন্ধ, বাড়িতে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। ব্যাপ্যার কী? দেখা গেল সান্যাল মহাশয় সপরিবার বিন্ধ্যাচল, না চন্দ্রনাথ ভ্রমণে গিয়াছেন। অনেকদিন আর দেখা নাই, হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা ঠুকঠুক শব্দে লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দুই গোরুর গাড়ি বোঝাই সান্যাল মশায় সপরিবারে বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ও লোকজন ডাকাইয়া হাঁটু সমান উঁচু জলবিছুটি ও অর্জুন গাছের জঙ্গল কাটিতে কাটিতে বাড়িতে ঢুকিতেছেন।

একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি লম্বা পা ফেলিয়া পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন— এই যে প্রসন্ন, কীরকম আছ, বেশ জাল পেতে বসেচ যে! কটা মাছ পড়ল?

নামতা মুখস্থরত অপুর মুখ অমনি অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সান্যাল মশায় যেখানে তালপাতার চাটাই টানিয়া বসিয়াছেন, সেদিকে হাতখানেক জমি উৎসাহে আগাইয়া বসিত। শ্লেট বই মুড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিত, যেন আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে, আর পড়াশোনার দরকার নাই; সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাগর ও উৎসুক চোখদুটি গল্পের প্রত্যেক কথা যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলিত।

কুঠির মাঠের পথে যে জায়গাটাকে এখন নাল্‌তাকুড়ির জোল বলে, ওইখানে আগে — অনেক কাল আগে গ্রামের মতি হাজরার ভাই চন্দর হাজরা কি বনের গাছ কাটিতে গিয়াছিল। বর্ষাকাল — এখানে ওখানে বৃষ্টির জলের তোড়ে মাটি খসিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ চন্দর হাজরা দেখিল এক জায়গায় যেন একটা পিতলের হাঁড়ির কানামত মাটির মধ্য হইতে একটুখানি বাহির হইয়া আছে। তখনই সে খুঁড়িয়া বাহির করিল। বাড়ি আসিয়া দেখেন — এক হাঁড়ি সেকেলে আমলের টাকা। তাই পাইয়া চন্দর হাজরা দিনকতক খুব বাবুগিরি করিয়া বেড়াইল— এসব সান্যাল মহাশয়ের নিজের চোখে দেখা।

এক একদিন রেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিত্রী পাহাড় আছে, তাহাতে উঠিতে তাঁহার স্ত্রীর কীরকম কষ্ট হইয়াছিল, নাভিগয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়া পাণ্ডার সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম। কোথাকার এক জায়গায় একটা খুব ভালো খাবার পাওয়া যায়, সান্যালমশায় নাম বলিলেন —প্যাঁড়া।

নামটা শুনিয়া অপুর ভারি হাসি পাইয়াছিল— বড়ো হইলে সে প্যাঁড়া কিনিয়া খাইবে।

কোন দেশে সান্যাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশ্বত্থতলায় থাকিত। এক ছিলিম গাঁজা পাইলে সে খুশি হইয়া বলিত— আচ্ছা কোন ফল তোমরা খাইতে চাও বলো। পরে ইপ্সিত ফলের নাম করিলে সে সম্মুখের যে-কোনো একটা গাছ দেখাইয়া বলিত—যাও,ওখানে গিয়া লইয়া আইস। লোকে গিয়া দেখিত হয়তো আমগাছে বেদানা ফলিয়া আছে, কিংবা পেয়ারা গাছে কলার কাঁদি ঝুলিয়া আছে।

রাজু রায় বলিতেন —ওসব মন্তরতন্তরের খেলা আর কী! সে বার আমার এক মামা—

দীনু পালিত কথা চাপা দিয়ে বলিতেন — মন্তরের কথা যখন ওঠালে, তখন একটা গল্প বলি শোনো। গল্প নয়, আমার স্বচক্ষে দেখা। বেলডাঙার বুধো গাড়োয়ানকে তোমরা দেখেচো কেউ? রাজু না দেখে থাকো, রাজকৃষ্ট ভায়া তো খুব দেখেচো। কাঠের দড়ি-বাঁধা এক ধরনের খড়ম পায়ে দিয়ে বুড়ো বরাবর নিতে-কামারের দোকানে লাঙলের ফাল পোড়াতে আসত। একশো বছর বয়সে মারা যায়, মারাও গিয়েছে আজ পঁচিশ বছরের ওপর। জোয়ান বয়সে আমরা তার সঙ্গে হাতের কবজির জোরে পেরে উঠতাম না।

একবার —অনেক কালের কথা— আমার তখন সবে হয়েচে উনিশ-কুড়ি বয়েস। চাকদা থেকে গঙ্গাচান করে গোরুর গাড়ি করে ফিরচি। বুধো গাড়োয়ানের গাড়ি— গাড়িতে আমি আমার খুড়িমা, আর অনন্ত মুখুজ্যের ভাইপো রাম, যে আজকাল উঠে গিয়ে খুলনায় বাস করছে। কানসোনার মাঠের কাছে প্রায় বেলা গেল, তখন ওসব দিকে কী রকম ভয়ভীত ছিল,তা রাজকৃষ্ট ভায়া জানো নিশ্চয়। একে মাঠের রাস্তা, সঙ্গে মেয়ে মানুষের দল, কিছু টাকাকড়িও আছে— বড্ড ভাবনা হলো। আজকাল যেখানে

নতুন গাঁ খানা বসেচে—ওই বরাবর এসে হলো কি জানো? জনাচারেক ষন্ডা মাকোগোছের মিশকালো লোক এসে গাড়ির পেছন দিকের বাঁশ দু-দিক থেকে ধল্লে। এদিকে দুজন, ওদিকে দুজন। দেখে তো মশাই আমাদের মুখে রা-টা নেই, কোনোরকমে গাড়ির মধ্যে বসে আছি, এদিকে তারাও গাড়ির বাঁশ ধরে সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে। বুধো গাড়োয়ান দেখি পিট পিট করে পিছনের দিকে চাইচে। ইশারা করে আমাদের কথা বলতে বারণ করে দিল। বেশ আছে! এদিকে গাড়ি একেবারে নবাবগঞ্জ থানার কাছাকাছি এসে পড়ল। বাজার দেখা যাচ্ছে, তখন সেই লোক কজন বল্লে— ওস্তাদজি, আমাদের ঘাট হয়েচে, আমরা বুঝতে পারিনি, ছেড়ে দাও। বুধো গাড়োয়ান বল্লে— সে হবে না ব্যাটারা। আজ সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাঁধিয়ে দোব। অনেক কাকুতি-মিনুতির পর বুধো বল্লে— আচ্ছা যা, ছেড়ে দিলাম এবার, কিন্তু কক্ষনো এরকম আর করিসনি। তবে তারা বুধো গাড়োয়ানের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। আমার স্বচক্ষে দেখা। মন্তরের চোটে ওই যে ওরা বাঁশ এসে ধরেচে, ধরেই রয়েচে —আর ছাড়বার সাধ্য নেই— চলেছে গাড়ির সঙ্গে। একেবারে পেরেক আঁটা হয়ে গিয়েছে। তা বুঝলে বাপু? মন্তরতন্তরের কথা—

গল্প বলিতে বলিতে বেলা যাইত। পাঠশালার চারিপাশের বনজঙ্গল অপরাহ্ণের রাঙা রৌদ্র বাঁকাভাবে আসিয়া পড়িত। কাঁঠালগাছের জগডুমুর গাছের ডালে ঝোলা গুলঞ্চলতার গায়ে টুনটুনি পাখি মুখ উঁচু করিয়া দোল খাইত। পাঠশালা ঘরে বনের গন্ধের সঙ্গে লতাপাতার চাটাই, ছেঁড়াখোড়া বই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির মেঝে ও কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া , সবসুদ্ধ মিলিয়া এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।

সে গ্রামের ছায়াভরা মাটির পথে একটি মুগ্ধ গ্রাম্য বালকের ছবি আছে। বই-দপ্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছন পিছন সাজিমাটি দিয়া কাচা, সেলাই করা কাপড় পরিয়া পাঠশালা হইতে ফিরিতেছে, তাহার ছোট্ট মাথাটির অমন রেশমের মতো নরম, চিক্কন সুখস্পর্শ চুলগুলি তাহার মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে— তাহার ডাগর ডাগর সুন্দর চোখদুটিতে কেমন যেন অবাক ধরনের চাহনি—যেন তাহারা এ কোন অদ্ভুত জগতে নতুন চোখ মেলিয়া চাহিয়া চাহিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালায় ঘেরা এইটুকুই কেবল তার পরিচিত দেশ — এখানেই মা রোজ হাতে করিয়া খাওয়ায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, দিদি কাপড় পরাইয়া দেয়, গণ্ডিটুকু ছাড়াইলেই তাহার চারিধারে ঘিরিয়া অপরিচয়ের অকূল জলধি! তাহার শিশুমন থই পায় না।

ওই যে বাগানের ওদিকে বাঁশবন —ওর পাশ কাটিয়া যে সরু পথটা ওধারে কোথায় চলিয়া গেল— তুমি বরাবর সোজা যদি ও পথটা বাহিয়া চলিয়া যাও, তবে শাঁখারিপুকুরের পাড়ের মধ্যে অজানা গুপ্তধনের দেশে পড়িবে —বড়ো গাছের তলায় সেখানে বৃষ্টির মধ্যে মাটি খসিয়া পড়িয়াছে— কত মোহরভরা হাঁড়ি-কলসির কানা বাহির হইয়া আছে, অন্ধকার বনঝোপের নীচে, কচু, ওল ও বন-কলমির চকচকে সবুজ পাতার আড়ালে চাপা —কেউ জানে না কোথায়।

একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা হইয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা।

সেদিন বৈকালে পাঠশালার অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায় কোনো গল্পগুজব হইল না, পড়াশোনা হইতেছিল—সে গিয়া বসিয়া পড়িতেছিল শিশুবোধক—এমন সময় গুরুমহাশয় বলিলেন— শেলেট নেও, শ্রুতিলিখন লেখো—

মুখে মুখে বলিয়া গেলেও অপু বুঝিয়াছিল গুরুমহাশয় নিজের কথা বলিতেছেন না, মুখস্থ বলিতেছেন, সে যেমন দাশুরায়ের পাঁচালি ছড়া মুখস্থ বলে, তেমনি।

শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলো অমন সুন্দর কথা একসঙ্গে পর পর সে কখনও শোনে নাই। ও সকল কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না, কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, ঝংকার-জড়ানো এক অপরিচিত শব্দসংগীত, অনভ্যস্ত শিশুকর্ণে অপূর্ব ঠেকিল এবং সব কথার অর্থ না বোঝার দরুনই কুহেলি-ঘেরা অস্পষ্ট শব্দ-সমষ্টির পিছনে একটা অপূর্ব দেশের ছবি বারবার উঁকি মারিতেছিল।

বড়ো হইয়া স্কুলে পড়িবার সময় সে বাহির করিয়াছিল ছেলেবেলাকার এই মুখস্থ শ্রুতিলিখন কোথায় আছে—

‘এই সেই জন্মস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি। ইহার শিখরদেশ আকাশপথে সততসমীর -সঞ্চরমাণ-জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত-অধিত্যকা-প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বন-পাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়.... পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া...,

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু সে জানে—তাহার মনে হয়, অনেক সময়ই মনে হয়—সেই যে বছর দুই আগে কুঠির মাঠে সরস্বতী পূজার দিন নীলকণ্ঠ পাখি দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন মাঠের ধার বাহিয়া একটা পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল সে। পথটার দু-ধারে যে কত কী অচেনা পাখি, অচেনা গাছপালা, অচেনা বনঝোপ,— অনেকক্ষণ সেদিন সে পথটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। মাঠের ওদিকে পথটা কোথায় যে চলিয়া গিয়েছে তাহা ভাবিয়া সে কূল পায় নাই।

তাহার বাবা বলিয়াছিল — ও সোনাডাঙা মাঠের রাস্তা, মাধবপুর-দশঘরা হয়ে সেই ধলচিতের খেয়াঘাটে গিয়ে মিশেচে!

ধলচিতের খেয়াঘাটে নয়, সে জানিত ও পথটা আরও অনেক দূরে গিয়াছে; রামায়ণ-মহাভারতের দেশে।

সেই অশথ গাছের সকলের চেয়ে উঁচু ডালটার দিকে চাহিয়া থাকিলে যাহার কথা মনে উঠে—সেই বহুদূরের দেশটা।

ওই পথের ওধারে অনেক দূরে কোথায় সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-পর্বত! বনঝোপের স্নিগ্ধ গন্ধে, না-জানার ছায়া নামিয়া আসা ঝিকিমিকি সন্ধ্যায়, সেই স্বপ্নলোকের ছবি তাহাকে অবাক করিয়া দিল। কতদূরে সে প্রস্রবণ-গিরির উন্নত শিখর,আকাশপথে সতত-সঞ্চরমান মেঘমালায় যাহার প্রশান্ত, নীল সৌন্দর্য সর্বদা আবৃত থাকে?

সে বড়ো হইলে যাইয়া দেখিবে।

৮

কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। ভাদ্র মাস।

অপু বৈকালবেলা বেড়াইতে যাইবার সংকল্প করিতেছে, এমন সময় তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলিল—কোথায় বেরুচ্চিস রে অপু? চাল ভাজা আর ছোলা ভাজা ভাজচি—বেরিয়ো না যেন। ...এক্ষুনি খাবি—

অপু শুনিয়াও শুনিল না—যদিও সে চাল-ছোলা ভাজা খাইতে ভালোবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্য ভাজিতে বসিয়াছে, ইহা সে জানে—তবুও সে কী করিতে পারে?— এতক্ষণ কী খেলাটাই চলিতেছে নীলুদের বাড়িতে? সে যখন বাহিরে দরজায় পা দিয়েছে, মার ডাক আবার কানে গেল—বেরুলি বুঝি!—ও অপু, বা রে দ্যাখো মজা ছেলের! গরম গরম খাবি—আমি তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে এসে ভাজতে লাগলাম —ও অপু-উ-উ—

অপু এক ছুট দিয়া নীলুদের বাড়ি গিয়া পৌঁছিল। অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসিবার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। নীলু বলিল,— চল অপু দক্ষিণ মাঠে পাখির ছানা দেখতে যাবি? অপু রাজি হইলে দুজনে দক্ষিণ মাঠে গেল। ধানক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া গিয়াছে। গ্রাম হইতে এক মাইলের উপর হইবে। অপু এতদূর কখনও বেড়াইতে আসে নাই—তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গণ্ডি ছাড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাহাকে টানিয়া আনিল! একটুখানি পরেই সে বলিল, বাড়ি চলো নীলুদা, আমায় মা বকবে, সন্দে হয়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারব না। তুমি বাড়ি চলো—

ফিরিতে যাইয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহাদের একটা বড়ো আমবাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল। সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে —এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুইয়ে টান দিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল— ও ভাই অপু!

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল — কীরে নীলুদা? পরে সে চাহিয়া দেখিল, যে সুঁড়ি পথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠানে গিয়া শেষ হইয়াছে — উঠানে একখানা ছোট্ট চালাঘর ও একটা বিলাতি আমড়ার গাছ। তাহার কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই নীলু ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল—

আতুরি ডাইনির বাড়ি!

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল ... আতুরি ডাইনির বাড়ি। ... সন্ধ্যাবেলা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহারা! কে না জানে যে ওই উঠানের গাছে চুরি করিয়া বিলাতি আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনিরা জেলেপাড়ার কোন এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচারির আমড়া খাইবার সাধ এ জন্মের মতো মিটিয়া যায়! কে না জানে সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনিতে ছোটো ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সে কিছুই জানিতে পারিবে না, কিন্তু বাড়ি গিয়া খাইয়া দাইয়া সেই যে বিছানায় শুইবে আর পরদিন উঠিবে না! কতদিন শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখে আতুরি ডাইনির গল্প শুনিতে শুনিতে সে বলিয়াছে — রাত্রিতে তুই ওসব গল্প বলিসনে দিদি, আমার ভয় করে, — তুই সেই কুঁচবরণ রাজকন্যের গল্পটা বল দিকি?

ঝাপসা দৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়িতে কেহ আছে কিনা এবং চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া হিম হইয়া গেল... বেড়ায় বাঁশের আগড়ের কাছে— অন্য কেহ নয়, একেবারে স্বয়ং আতুরি ডাইনি — তাহাদের— এমন কী যেন শুধু তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া! ...

যাহার জন্য এত ভয়, তাহাকে একেবারে সম্মুখেই এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপুর সামনে পিছনে কোনো দিকেই পা উঠিতে চাহিল না।

আতুরি বুড়ি ভুরু কুঁচকাইয়া, তোবড়ানো গালটা আরও ঝুলাইয়া ভালো করিয়া লক্ষ করিবার ভঙ্গিতে মুখটা সামনের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া পায়ে পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। অপু দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে। কোনো দিকেই আর পলাইবার পথ নাই— যে কারণেই হউক ডাইনির রাগটা তাহার উপরেই — এখনই তাহার প্রাণটি সংগ্রহ করিয়া কচুর পাতায় পুরিবে!

মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে যে আজ মায়ের মনে কষ্ট দিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার ফল এই ফলিতে চলিল! সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল — আমি কিছু জানিনে ও বুড়ি পিসি — আমি আর কিছু করব না — আমায় ছেড়ে দাও, আমি ইদিকে আর কখনও আসব না — আজ ছেড়ে দাও ও বুড়ি পিসি—

নীলু তো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু অপুর এত ভয় হইয়াছিল যে চোখে তাহার জল ছিল না।

বুড়ি বলিল — ভয় কী মোরে, ও বাবারা? মোরে ভয় কী? .... পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল, মুই কি ধরে নেব খোকারা? এসো মোর বাড়িতি এসো — আমচুর দেবানি এসো —

আমচুর! ডাইনি বুড়ি ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া বাড়িতে পুরিতে চাহিতেছে — গেলেই আর কী! ... ডাইনিরা রাক্ষসীরা যে এরকম ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলে — এরকম কত গল্প তো সে মার মুখে শুনিয়াছে!

এখন সে কী করে! উপায়?

বুড়ি তাহার দিকে আরও খানিকটা আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল — ভয় কী, ও মোর বাবারা? মুই কিছু বলব না ভয় কী মোরে?

আর কী সব শেষ! মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিবার আর দেরি নাই, হাত বাড়াইয়া তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনি কচুর পাতায় পু-রিল! সে আড়ষ্ট কণ্ঠে দিশাহারা ভাবে বলিয়া উঠিল, ও বুড়ি পিসি, আমার মা কাঁদবে, আমায় আজ আর কিছু বোলো না— আমি তোমার গাছে কোনো দিন আমড়া নিতে আসিনি—আমার মা কাঁদবে—

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে... বাড়ি, ঘরদোর, গাছপালা, নীলু, চারিধার যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। কেহ কোনোদিকে নাই...কেবল একমাত্র সে আর আতুরি ডাইনির ক্রূর দৃষ্টি মাখানো একজোড়া চোখ... আর অনেকদূরে কোথায় যেন মা আর তাহার চাল ভাজা খাওয়ার ডাক!...

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরিয়া সাহস জোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্তরব করিয়া প্রাণভয়ে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট, শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙিয়া ডিঙাইয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুই চোখ যায় ছুটিল — নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে।...

ইহাদের ভয়ের কারণ কী বুঝিতে না পারিয়া বুড়ি ভাবিল— মুই মাত্তিও যাইনি, ধত্তিও যাইনি—কাঁচা ছেলে, কী জানে মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা? খোকাডা কাদের?

অপু যখন বাড়ি আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্বজয়া সবে উনুন ধরাইয়া তালের বড়া ভাজিবার আয়োজন করিতেছে, দুর্গা নিকটে বসিয়া তাল চাঁচিয়া রস বাহির করিতেছে। ছেলেকে দেখিয়া বলিল—কোথায় ছিলি বল দিকি? সেই বেরিয়েচো বিকেলবেলা, কিছুই তো আজ খাবার খেলিনে—খিদে-তেষ্টা পায় না?

সে বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে, মা তাহাকে চালভাজা দেওয়ার কোনো আগ্রহই না দেখাইয়া তালের রসটা ঘন না পাতলা হইয়াছে, তাহাই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতেছে।

দুর্গা বলিল — মা শিগগির শিগগির ভেজে নাও। বড্ড মেঘ করে আসচে, বিষ্টি এলে আর ভাজা হবে না — ঘরে যে জল পড়ে! — সেদিনকার মতো হবে কিন্তু —

দেখিতে দেখিতে চারিধার ঘিরিয়া ঘনাইয়া-আসা মেঘের ছায়ায় বাঁশবনের মাথা কালো হইয়া উঠিল। খুব মেঘ জমিয়া আকাশ অন্ধকার হইয়াছে, অথচ বৃষ্টি এখনও নামে নাই — এসময় মনে এক প্রকার আনন্দ ও কৌতূহল হয় — না জানি কী ভয়ংকর বৃষ্টিই আসিতেছে, পৃথিবী বুঝি ভাসাইয়া লইয়া যাইবে —অথচ বৃষ্টি হয় প্রতিবারই, পৃথিবী কোনোবারেই ভাসায় না, তবুও এ মোহটুকু ঘোচে না! দুর্গার মন সেই অজানার আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সে মাঝে মাঝে দাওয়ার ধারে আসিয়া নীচু চালের ছাঁচ হইতে মুখ বাড়াইয়া মেঘান্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

সর্বজয়া খানকতক বড়া ভাজিয়া বলিল — এই বাটিটা করে ওকে দে তো দুগ্‌গা। — ওর খিদে পেয়েচে, বিকেল থেকে কিছু তো খায়নি! এই শেষকথাই কাল হইল — এতক্ষণ অপু যা হয় এক রকম ছিল কিন্তু মায়ের শেষের দিকের আদরের সুরে তাহার অভিমানের বাঁধ একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, সে বড়া সুদ্ধ বাটিটা উঠানে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল — আমি খাব না তো বড়া, কখ্‌খনো খাব না — যাও —

সর্বজয়া ছেলের কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। ক্ষোভে, রাগে সে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল — তোমার আজ হয়েছে কী! তোমার অদৃষ্টে আজ ছাই লেখা আছে, খেয়ো এখন তাই গরম গরম।

অপু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা মা আমি চালভাজা খাইনি তাতে আমার মনে কষ্ট হয় না? আমি বিকেল থেকে ভাবছিনে বুঝি? পরে সে রাগে আত্মহারা হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া বাহিরের উঠানের দিকে মরিয়ার মতো ছুটিল।

৯

এবার বাড়ি হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল— বাড়ি থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও বাইরে বেরুলে দুধটা, ঘিটা—ওর শরীরটা সারবে এখন।

অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনও যায় নাই। এ গাঁয়েরই বকুলতলা, গোঁসাইবাগান, চালতেতলা, নদীর ধার—বড়োজোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক-এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে মাঝে বৈশাখ কী জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে তাহার মা বৈকালে নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত। নদীর ওপারের খড়ের মাঠে বাবলা গাছে গাছে হলুদ রঙের ফুল ফুটিয়া থাকিত, গোরু চরিত, মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো শিমুল গাছটাকে দেখিলে মনে হইত যেন কত কালের পুরাতন গাছটা।

রাখালেরা নদীর ধারে গোরুকে জল খাওয়াইতে আসিত, ছোটো একখানা জেলে ডিঙি বাহিয়া তাহাদের গাঁয়ের অক্রুর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিতে যাইত, মাঠের মাঝে ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল বৈকালের ঝিরঝিরে বাতাসে দুলিতে থাকিত— ঠিক সেইসময় হঠাৎ একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত — সে সব প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিত না। শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত — দিদি দিদি দ্যাখ দ্যাখ ওইদিকে—পরে সে মাঠের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—ওই যে? ওই গাছটার পিছনে? কেমন অনেক দূর না?

দুর্গা হাসিয়া বলিত— অনেক দূর—তাই দেখাচ্ছিলি ? দূর তুই একটা পাগল!

আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই উৎসাহে তাহার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল, দিন গুনিতে গুনিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাঢু-দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল—বাবা, যেখান দিয়ে রেল যায় সেই রেলের রাস্তা কোন দিকে!

তাহার বাবা বলিল—সামনেই পড়বে এখন, চলো না। আমরা রেললাইন পেরিয়ে যাব এখন—

সেবার তাহাদের রাঙি গাইয়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা জায়গা খুঁজিয়া দুই-তিন দিন ধরিয়া কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সে তার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল। পৌষ মাস, ক্ষেতে ক্ষেতে কলাই গাছের ফলে দানা বাঁধিয়াছে, সে ও তাহার দিদি নীচু হইয়া ক্ষেত হইতে মাঝে মাঝে কলাই ফল তুলিয়া খাইতেছিল— তাহাদের সামনে কিছু দূরে নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা, খেজুর গুড় বোঝাই গোরুর গাড়ির সারি পথ বাহিয়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিতে করিতে আষাঢুর হাটে যাইতেছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তার ওপারে বহুদূর ঝাপসা মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কী দেখিতেছিল, হঠাৎ

সে বলিয়া উঠিল, — এক কাজ করবি অপু; চল যাই আমরা রেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি?

অপু বিস্ময়ের সুরে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল— রেলের রাস্তা — সে যে অনেক দূর ! সেখানে কী করে যাবি?

তাহার দিদি বলিল—বেশি দূর বুঝি! কে বলেছে তোকে—ওই পাকা রাস্তার ওপারে তো—না?

অপু বলিল— নিকটে হলে তো দেখা যাবে ? পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায় - চল দিকি দিদি, গিয়ে দেখি।

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিল—বড্ড অনেক দূর, না? যাওয়া যাবে না—

—কিছু তো দেখা যায় না—অত দূরে গেলে আবার আসব কী করে? তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল, লোভও হইতেছিল, ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরিয়াভাবে বলিয়া উঠিল—চল যাই দেখে আসি অপু—কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসব এখন, হয়তো রেলের গাড়ি যাবে এখন—মাকে বলব বাছুর খুঁজতে দেরি হয়ে গেল—

প্রথমে তাহারা একটুখানি এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল কেহ তাহাদিগকে লক্ষ করিতেছে কিনা। পরে পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপুর রোদে ভাই-বোনে মাঠ বিল জলা ভাঙিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে ছুটিল। দৌড়, দৌড়, দৌড়—নবাবগঞ্জের লাল রাস্তা ক্রমে অনেক দূর পিছাইয়া পড়িল—রোয়ার মাঠ, জলসত্রতলা, ঠাকুর-ঝি পুকুর বামধারে, ডানধারে দূরে দূরে পড়িয়া রহিল—সামনে—একটা ছোটো বিল নজরে আসিতে লাগিল। তাহার দিদি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—মা টের পেলে কিন্তু—পিঠের ছাল তুলবে। অপু একবার হাসিল—মরিয়ার হাসি। আবার দৌড়, দৌড়, দৌড়— জীবনে এই প্রথম বাধাহীন গণ্ডিহীন, মুক্তির উল্লাসে তাহাদের তাজা তরুণ রক্ত তখন মাতিয়া উঠিয়াছিল—পরে কী হইবে, তাহা ভাবিবার অবসর কোথায়?

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয়। খানিক দূরে গিয়া একটা বড়ো জলা পড়িল একেবারে সামনে–হোগলা আর শোলা গাছে ভরা, তাহার উপর তাহার দিদি পথ হারাইয়া ফেলিল—কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না—সামনে কেবল ধানক্ষেত, জলা, আর বেত-ঝোপ। ঘন বেতবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে জলে পা পুঁতিয়া যায়, রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে, শীতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল—দিদির পরনের কাপড় কাঁটায় নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল, তাহার নিজের পায়ে দু-তিনবার কাঁটা টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইল— শেষে রেলরাস্তা দূরের কথা, বাড়ি ফেরাই মুশকিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না, জল ভাঙিয়ে ধানক্ষেত পার হইয়া যখন তাহারা বহুকষ্টে আবার পাকা রাস্তায় আসিয়া উঠিল তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ি আসিয়া তাহার দিদি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ বাঁচাইল।

সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবেই সামনে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না, পথ হারাইতে হইবে না— বকুনি খাইতে হইবে না!

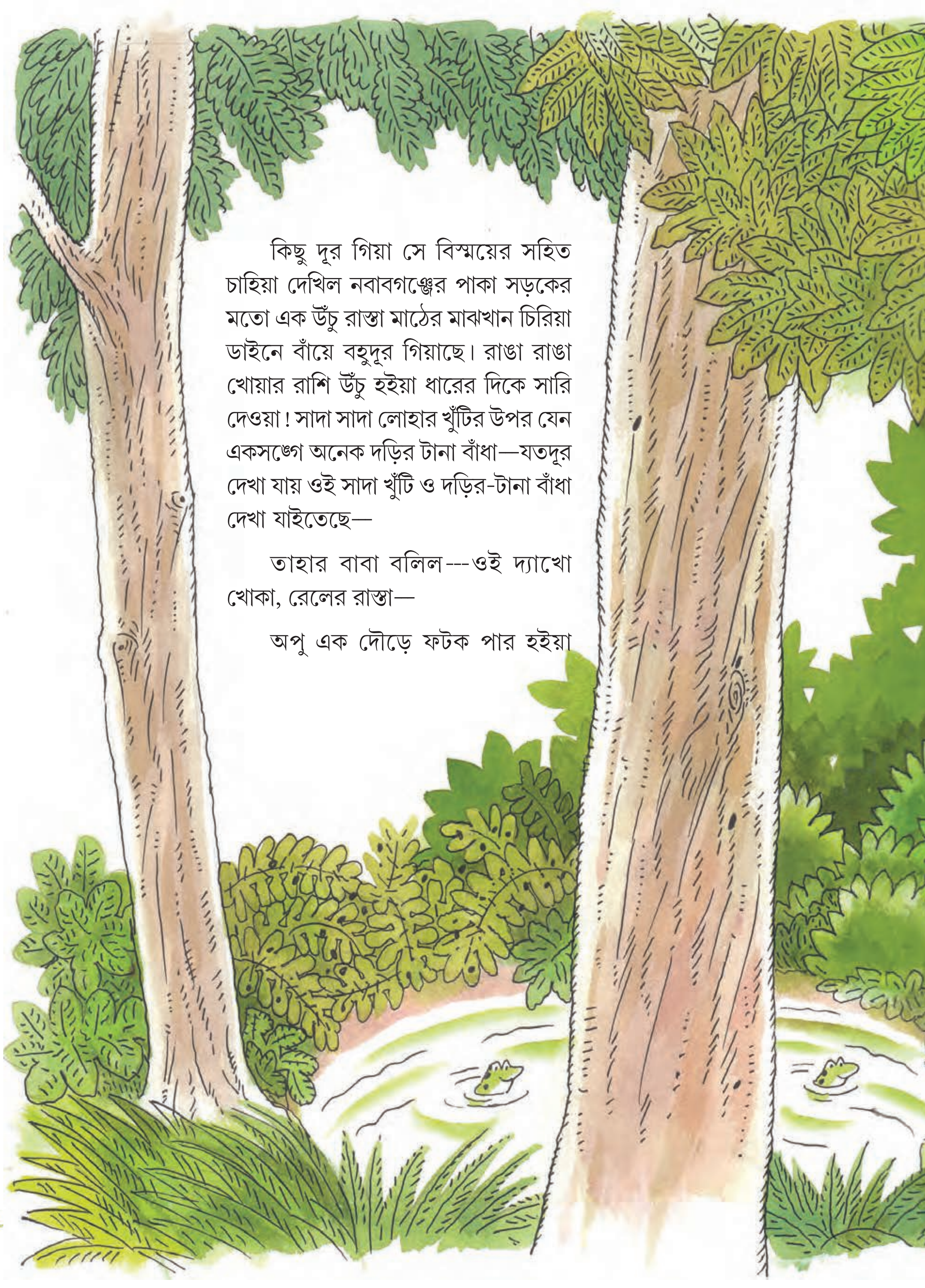

কিছু দূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মতো এক উঁচু রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সারি দেওয়া! সাদা সাদা লোহার খুঁটির উপর যেন একসঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা—যতদূর দেখা যায় ওই সাদা খুঁটি ও দড়ির-টানা বাঁধা দেখা যাইতেছে—

তাহার বাবা বলিল---ওই দ্যাখো খোকা, রেলের রাস্তা—

অপু এক দৌড়ে ফটক পার হইয়া

রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুইদিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন? উহার উপর দিয়া রেলগাড়ি যায়? কেন? মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার উপর দিয়া যায় কেন? পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না? কেন? ওগুলোকে তার বলে ? তাহার মধ্যে সোঁ সোঁ কীসের শব্দ? তারে খবর যাইতেছে? কাহারা খবর দিতেছে ? কী করিয়া খবর দেয় ? ওদিকে কী ইস্টিশান ? এদিকে কী ইস্টিশান ?

সে বলিল—বাবা, রেলগাড়ি কখন আসবে? আমি রেলগাড়ি দেখব বাবা।

—রেলগাড়ি এখন কী করে দেখবে? ...সেই দুপুরের সময় রেলগাড়ি আসবে, এখনও দু-ঘণ্টা দেরি!

—তা হোক বাবা, আমি দেখে যাব, আমি কখনও দেখিনি—হ্যাঁ বাবা—

—ওরকম কোরো না, ওই জন্যে তোমায় কোথাও আনতে চাইনে—এখন কী করে দেখবে? সেই দুপুর একটা অবধি বসে থাকতে হবে তাহলে এই ঠায় রোদ্দুরে, চলো আসবার দিন দেখাব।

অপুকে অবশেষে জল-ভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

তুমি চলিয়া যাইতেছ... তুমি কিছুই জানো না, পথের ধারে তোমার চোখে কী পড়িতে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিককে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে তুমিও একজন দেশ আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই! আমি যেখানে আর কখনও যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইল, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কিনা, তাহাতে আমার কী আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ। আজ সর্বপ্রথম মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে!

সন্ধ্যার পর তাহারা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিল। শিষ্যের নাম লক্ষ্মণ মহাজন, বেশ বড়ো চাষি ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাহিরের বড়ো আটচালা ঘরে মহা আদরে তাহারা থাকিবার স্থান করিয়া দিল।

লক্ষ্মণ মহাজনের ছোটোভাইয়ের স্ত্রী সকালে স্নান করিবার জন্য পুকুরের ঘাটে আসিয়াছিল — জলে নামিতে গিয়া পুকুরের পাড়ে নজর পড়াতে সে দেখিল পুকুরপাড়ের কলাবাগানে একটি অচেনা ছোটো ছেলে একখানি কঞ্চি হাতে কলাবাগানের একবার এদিক একবার ওদিক পায়চারি করিতেছে ও পাগলের মতো আপন মনে বকিতেছে। সে ঘড়া নামাইয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল — তুমি কাদের বাড়ি এসেছ, খোকা?

অপুর যত জারিজুরি তাহার মায়ের কাছে। বাহিরে সে বেজায় মুখচোরা।

প্রথমটা অপুর মাথায় আসিল যে টানিয়া দৌড় দেয়। পরে সংকুচিত সুরে বলিল — ওই ওদের বাড়ি —

বধূটি বলিল — বটঠাকুরদের বাড়ি? বটঠাকুরের গুরুমশায়ের ছেলে? ও!

বধূ সঙ্গে করিয়া তাহাকে নিজের বাড়িতে লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ি পৃথক — লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ি হইতে সামান্য দূরে, কিন্তু মধ্যে পুকুরটা পড়ে।

বধূর ব্যবহারে অপুর লাজুকতা কাটিয়া গেল! সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ঘরের জিনিসপত্র কৌতূহলের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ওঃ কত কী জিনিস! ... তাহাদের বাড়িতে এরকম জিনিস নাই। এরা খুব বড়োলোক তো! কড়ির আলনা, রং-বেরং-এর ঝুলন্ত শিকা, পশমের পাখি, কাচের

পুতুল, মাটির পুতুল, শোলার গাছ — আরও কত কী। — দু-একটা জিনিস সে ভয়ে ভয়ে হাতে তুলিয়া নাড়িয়া দেখিল।

বধূ এতক্ষণ ভালো করিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখে নাই — কাছের গোড়ায় দেখিয়া মনে হইল যে, এখনও ভারি ছেলেমানুষ, মুখের ভাব যেন পাঁচ বছরের ছেলের মতো কচি। এমন সুন্দর অবোধ চোখের ভাব সে আর কোনো ছেলের চোখে এপর্যন্ত দেখে নাই — এমন রং, এমন গড়ন, এমন সুন্দর মুখ, এমন তুলি দিয়া আঁকা ডাগর ডাগর নিষ্পাপ চোখ ... অচেনা ছেলেটির উপর বধূর বড়ো মমতা হইল।

অপু বসিয়া নানা গল্প করিল — বিশেষ করিয়া কল্যকার রেলপথের কথাটি। খানিকটা পরে বধূ মোহনভোগ তৈয়ারি করিয়া খাইতে দিল। একটা বাটিতে অনেকখানি মোহনভোগ, এত ঘি দেওয়া যে আঙুলে ঘিয়ে মাখামাখি হইয়া যায়। অপু একটুখানি মুখে তুলিয়া খাইয়া অবাক হইয়া গেল — এমন অপূর্ব জিনিস আর সে কখনো খায় নাই তো। — মোহনভোগে কিশমিশ দেওয়া কেন? কই তাহার মায়ের তৈরি মোহনভোগে তো কিশমিশ থাকে না? বাড়িতে সে মার কাছে আবদার ধরে — মা, আজ আমাকে মোহনভোগ করে দিতে হবে। তাহার মা হাসি-মুখে বলে — আচ্ছা ওবেলা তোকে করে দেব — পরে সে শুধু সুজি জলে সিদ্ধ করিয়া একটু গুড় মিশাইয়া পুলটিসের মতো একটা দ্রব্য তৈয়ারি করিয়া কাঁসার সর-পুরিয়া থালাতে আদর করিয়া ছেলেকে খাইতে দেয়। অপু তাহাই খুশির সহিত এতদিন খাইয়া আসিয়াছে, মোহনভাগ যে এরূপ হয় তাহা সে জানিত না। আজ কিন্তু তাহার মনে হইল এ মোহনভোগে আর মায়ের তৈয়ারি মোহনভোগে আকাশ-পাতাল তফাত! ... সঙ্গে সঙ্গে মায়ের উপর করুণায় ও সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হয়তো তাহার মাও জানে না যে, এ রকমের মোহনভোগ হয়! — সে যেন আবছায়াভাবে বুঝিল, তাহার মা গরিব, তাহারা গরিব — তাই তাহাদের বাড়ি ভালো খাওয়াদাওয়া হয় না।

একদিন পাড়ার এক ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর বাড়ি অপুর নিমন্ত্রণ হইল। দুপুরবেলা, সে-বাড়ির একটি মেয়ে আসিয়া অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। ওদের রান্নাঘরের দাওয়ায় যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া জল ছিটাইয়া অপুকে খাবার জায়গা করিয়া দিল। যে মেয়েটি অপুকে ডাকিতে আসিয়াছিল, নাম তার অমলা, বেশ টকটকে ফর্সা রং, বড়ো বড়ো চোখ, বেশ মুখখানি, বয়স তার দিদির মতো! অমলার মা কাছে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন, নিজের হাতের তৈয়ারি চন্দ্রপুলি পাতে দিলেন। খাওয়ার পরে অমলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি দিয়া গেল। সেদিন বৈকালে খেলিতে খেলিতে অপুর পায়ের আঙুল হঠাৎ বাগানের বেড়ার দুই বাঁশের ফাঁকে পড়িয়া আটকাইয়া গেল। টাটকা চেরা নতুন বাঁশের বেড়া, আঙুল কাটিয়া রক্তারক্তি হইল, অমলা ছুটিয়া আসিয়া পা-খানা বাঁশের ফাঁক হইতে বাহির না করিলে গোটা আঙুলটাই কাটা পড়িত। সে চলিতে পারিতেছিল না, অমলা তাহাকে কোলে করিয়া গোলার পাশ হইতে পাথরকুচির পাতা তুলিয়া বাটিয়া আঙুলে বাঁধিয়া দিল। পাছে বাবার বকুনি খাইতে হয়, এই ভয়ে অপু একথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না।

পরে অপু অমলার সঙ্গে তাহাদের বাড়ি গেল। অমলা তাহাদের আলমারি খুলিয়া কাচের বড়ো মেম-পুতুল, মোমের পাখি, গাছ আরও কত কী দেখাইল। কালীগঞ্জের স্নানযাত্রার মেলা হইতে সেসব

নাকি কেনা, অপু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল। নতুন নতুন খেলার জিনিস — একটা রবারের বাঁদর, সেটা তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া চোখ পিট পিট করিবে — একটা কীসের পুতুল, সেটার পেট টিপিলে দু-হাতে মৃগী রোগীর মতো হঠাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া খঞ্জনি বাজাইতে থাকে — সকলের চেয়ে আশ্চর্যের জিনিস হইতেছে একটা টিনের ঘোড়া। রানুদির কাকা তাহাদের বাড়ির দালানের ঘড়িতে যেমন দম দেয়, ওইরকম দম দিয়া ছাড়িয়া দিলে খড়খড় করিয়া মেঝের ওপর চলিতে থাকে — অনেক দূর যায় — ঠিক যেন একেবারে সত্যিকারের ঘোড়া। সেইটা দেখিয়া অপু অবাক হইয়া গেল। হাতে তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত উলটাইয়া দেখিয়া অমলার দিকে চাহিয়া বলিল — এ কী রকম ঘোড়া, বেশ তো! এ কোথা থেকে কেনা, এর দাম কত?

তাহার পর অমলা তাহাকে একটা সিঁদুরের কৌটা খুলিয়া দেখাইল — সেটার মধ্যে রাঙা রং-এর একখানা ছোটো রাংতার মতো কী? অপু বলিল — ওটা কী? রাংতা?

অমলা হাসিয়া বলিল — রাংতা হবে কেন? — সোনার পাত দেখনি অপু? অপু সোনার পাথ দেখে নাই। সোনার রং কি অত রাঙা? সোনার পাতখানা নাড়িয়া চাড়িয়া ভালো করিয়া দেখিতে লাগিল। অমলার সহিত বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে সে ভাবিল — আহা, দিদিটার ওসব খেলনা কিছুই নেই — মরে কেবল শুকনো নাটাফল আর রড়ার বিচি কুড়িয়ে আর শুধু পরের পুতুল চুরি করে মার খায়! ... তাহার পয়সা থাকিলে সে দিদিকে একটা কলের ঘোড়া কিনিয়া দিত — আর একটা রবারের বাঁদর ... তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া সেটা চোখ পিটপিট করে ...

বধূর কাছে একজোড়া পুরোনো তাস ছিল; ঠিক একজোড়া বলা চলে না, সেটা নানা জোড়া তাসের পরিত্যক্ত কাগজগুলি এক জায়গায় জড়ো করা আছে মাত্র — অপু সেগুলি লইয়া মধ্যে মধ্যে নাড়ে চাড়ে। রানুদির বাড়িতে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা তাসের আড্ডা বসিত, সে বসিয়া বসিয়া খেলা দেখিত। টেক্কা, গোলাম, সাহেব, বিবি — কাগজ ধরা লইয়া মারামারি হয় — বেশ খেলা! সে তাস খেলিতে জানে না, তাহার মা দিদি কেহই জানে না। এক একদিন তাহার মা তাস খেলিতে যায়, তাহার মাকে লইয়া কেহ বসিতে চায় না, সকলে বলে, ও কিছু খেলা জানে না।

সে যদি এক জোড়া তাস পায় তবে সে, মা ও দিদি খেলে। খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরবেলা তাদের বাড়ির বনের ধারের দিকে সেই জানালাটা... যেটার কবাটগুলোর মধ্যে কী পোকায় কাটিয়া সরিষার মতো গুঁড়া করিয়া দিয়াছে... নাড়া দিলে ঝুরঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়ে, পুরানো কাঠের গুঁড়ার গন্ধ বার হয় — জানালার ধারের বন থেকে দুপুরের হাওয়ায় গন্ধভেদালি লতার কটু গন্ধ আসে, রোয়াকের কালমেঘের গাছের জঙ্গলের দিদির পরিচিত কাঁচপোকাটা একবার ওড়ে, আবার বসে, আবার ওড়ে, আবার বসে — নির্জন দুপুরে তারা তিনজনে সেই জানালাটির ধারে মাদুর পাতিয়া বসিয়া আপন মনে তাস খেলিবে।

সন্ধ্যার পর বধূর ঘরে অপুর নিমন্ত্রণ ছিল। খাইতে বসিয়া খাবার জিনিসপত্র ও আয়োজনের ঘটা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ছোটো একখানা ফুলকাটা রেকাবিতে আলাদা করিয়া নুন ও নেবু কেন? নুন নেবু তো মা পাতেই দেয়! প্রত্যেক তরকারির জন্যে আবার আলাদা বাটি! — তরকারিই বা কত! অতবড়ো গলদা চিংড়ির মাথাটা কি তাহার একার জন্য?

লুচি! লুচি! তাহার ও তাহার দিদির স্বপ্নকামনার পারে এক রূপকথার দেশের নীল-বেলা আবছায়া দেখা যায় ... কত রাতে, দিনে, ওলের ডাঁটাচচ্চড়ি ও লাউ ছেঁচকি দিয়া ভাত খাইতে খাইতে, কত জল-খাবার-খাওয়া-শূন্য সকালে বিকালে, অন্যমনস্ক মন হঠাৎ লুব্ধ, উদাস গতিতে ছুটিয়া চলে সেখানে — যেখানে গরম রোদে দুপুরবেলা তাহাদের পাড়ার পাকা রাধুঁনি বীরু রায় গামছা কাঁধে ঘুরিয়া বেড়ায়, সদ্য তৈয়ারি বড়ো উনুনের উপর বড়ো লোহার কড়াই-এ ঘি চাপানো থাকে, লুচি-ভাজার অপূর্ব সুধারুচি-ঘ্রাণ আসে, কত ছেলেমেয়ে ভালো কাপড়জামা পরিয়া যাতায়াত করে, গাঙ্গুলি বাড়ির বড়ো নাটমন্দির ও জলপাইতলা বিছাইয়া গ্রীষ্মের দিনে সতরঞ্চ পাতা হয়, একদিন মাত্র বছরে সে দেশের ঠিকানা খুঁজিয়া মেলে — সেই চৈত্র বৈশাখ মাসে রামনবমী দোলের দিনটা — তাহাদের সেদিন নিমন্ত্রণ থাকে ওপাড়ার গাঙ্গুলি বাড়ি। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সে সুদিনের উদয় হইল কী করিয়া! খাইতে বসিয়া বারবার তাহার মনে হইতেছিল, আহা, তাহার দিদি এরকম খাইতে পায় নাই কখনও!

১০

দিন দুই পরে হরিহর ছেলেকে লইয়া বাড়ি আসিল।

এই মোটে কয়দিন, এরই মধ্যে সর্বজয়া ছেলেকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছে না।

দুর্গার খেলা কয়দিন হইতে ভালোরকম জমে নাই, অপুর বিদেশ যাত্রার দিনকতক আগে দেশি-কুমড়ার শুকনো খোলার নৌকা লইয়া ঝগড়া হওয়াতে দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল — এখন আরও অনেক কুমড়ার খোলা জমিয়াছে, দুর্গা কিন্তু আর সেগুলি জলে ভাসাইতে যায় না — কেন মিছিমিছি এনিয়ে ঝগড়া করে তার কান মলে দিলাম? আসুক সে ফিরে, আর কক্ষনো তার সঙ্গে ঝগড়া নয়, সব খোলা সে-ই নিয়ে নিক।

বাড়ি আসিয়া অপু দিন পনেরো ধরিয়া নিজের অদ্ভুত ভ্রমণকাহিনি বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত আশ্চর্য জিনিস সে দেখিয়াছে এই কয়দিনে! রেলের রাস্তা, যেখান দিয়া সত্যিকারের রেলগাড়ি যায়! মাটির আতা, পেঁপে, শশা— অবিকল যেন সত্যিকার ফল! সেই পুতুলটা, যেটার পেট টিপিলে মৃগী রোগীর মতো হাত-পা ছুঁড়িয়া হঠাৎ খঞ্জনি বাজাইতে শুরু করে!

কতদূর যে সে গিয়াছিল, কত পদ্মফুলে ভরা বিল কত অচেনা নতুন গাঁ পাড় হইয়া কত মাঠের উপরকার নির্জন পথ বাহিয়া, সেই যে কোন গাঁয়ের পথের ধারে কামার-দোকানে বাবা তাহাকে জল খাওয়াইতে লইয়া গেলে, তাহারা তাহাকে বাড়ির মধ্যে ডাকিয়া লইয়া যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া দুধ, চিঁড়ে, বাতাসা খাইতে দিয়াছিল! কোন্‌টা ফেলিয়া সে কোন্‌টা গল্প করে!

রেলরাস্তার গল্প শুনিয়া তাহার দিদি মুগ্ধ হইয়া যায়, বারবার জিজ্ঞাসা করে —কত বড়ো নোয়াগুনো দেখলি অপু? তার টাঙানো বুঝি ? খুব লম্বা? রেলগাড়ি দেখতে পেলি? গেল?

না — রেলগাড়ি অপু দেখে নাই। ওইটাই কেবল বাদ পড়িয়াছে — সে শুধু বাবার দোষে। মোটে ঘণ্টা চার-পাঁচ রেলরাস্তার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই রেলগাড়ি দেখা যাইত — কিন্তু বাবাকে সে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বেলা হইয়া যাওয়াতে ব্যস্ত অবস্থায় সর্বজয়া তাড়াতাড়ি অন্যমনস্কভাবে সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া উঠানে পা দিতেই কী যেন একটা সরু দড়ির মতো বুকে আটকাইল ও সঙ্গে সঙ্গে কী যেন একটা পটাং করিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার শব্দ হইল এবং দু-দিক হইতে দুটা কী, উঠানে ঢিলা হইয়া পড়িলা গেল। সমস্ত কার্যটি চক্ষের নিমেষে হইয়া গেল, কিছু ভালো করিয়া দেখিবার কী বুঝিবার পূর্বেই।

অল্পখানিক পরেই অপু বাড়ি আসিল। দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল — নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না — এ কী! বা রে, আমার টেলিগিরাপের তার ছিঁড়লে কে?

ক্ষতির আকস্মিকতায় ও বিপুলতায় প্রথমটা সে কিছু ঠাহর করিতে পারিল না। পরে একটু সামলাইয়া লইয়া চাহিয়া দেখিল উঠানের মাটিতে ভিজা পায়ের দাগ এখনও মিলায় নাই। তাহার মনের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিল — মা ছাড়া আর কেউ নয়। কখ্খনো আর কেউ নয়, ঠিক মা। বাড়ি ঢুকিয়া সে দেখিল মা বসিয়া বসিয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে কাঁঠাল-বিচি ধুইতেছে। সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল এবং যাত্রাদলের অভিমন্যুর মতো ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বাঁশির সপ্তমের মতো রিনরিনে তীব্র মিষ্টি সুরে কহিল — আচ্ছা মা, আমি কষ্ট করে ছোটাগুলো বুঝি বন-বাগান ঘেঁটে নিয়ে আসিনি?

সর্বজয়া পিছনে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিল কী নিয়ে এসেচিস? কী হয়েছে?

—আমার বুঝি কষ্ট হয় না? কাঁটায় আমার হাত-পা ছড়ে যায়নি বুঝি?

—কী বলে পাগলের মতো? হয়েচে কী?

—কী হয়েচে! আমি এত কষ্ট করে টেলিগিরাপের তার টাঙালাম, তার ছিঁড়ে দেওয়া হয়েচে, না?

—তুমি যত উদঘুট্টি কাণ্ড ছাড়া তো এক দণ্ড থাকো না বাপু! পথের মাঝখানে কী টাঙানো রয়েছে — কী জানি টেলিগিরাপ কি কি-গিরাপ, আসচি তাড়াতাড়ি, ছিঁড়ে গেল তখন কী করব বলো —

পরে সে পুনরায় নিজ কাজে মন দিল।

উঃ! কী ভীষণ হৃদয়হীনতা ! আগে আগে সে ভাবিত বটে যে, তাহার মা তাহাকে ভালোবাসে — অবশ্য যদিও তাহার সে ভ্রান্ত ধারণা অনেকদিন ঘুচিয়া গিয়াছে —তবুও মাকে একটা নিষ্ঠুর পাষাণীরূপে কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কাল সারাদিন কোথায় নীলমণি জ্যাঠার ভিটা, কোথায় পালিতদের বড়ো আমবাগান, কোথায় প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের বাঁশবন — ভয়ানক ভয়ানক জঙ্গলে একা ঘুরিয়া বহু কষ্টে উঁচু ডাল হইতে দোলানো গুলঞ্চলতা কত কষ্টে জোগাড় করিয়া সে আনিল, এখুনি রেল-রেল খেলা হইবে সব ঠিকঠাক, আর কি না...

হঠাৎ সে মাকে একটা খুব কড়া, খুব রূঢ়, খুব একটা প্রাণ-বিঁধানো কথা বলিতে চাহিল — এবং খানিকটা দাঁড়াইয়া বোধহয় অন্য কিছু ভাবিয়া না পাইয়া আগের চেয়েও তীব্র নিখাদে বলিল আমি আজ

ভাত খাব না যাও — কখ্‌খনো খাব না—

তাহার মা বলিল — না খাবি না খাবি যা — ভাত খেয়ে একেবারে রাজা করে দেবেন কিনা? এদিকে তো রান্না নামাতে তর সয় না — না খাবি যা, দেখব খিদে পেলে কে খেতে দ্যায়?

ব্যাস! চক্ষের পলকে — সব আছে, আমি আছি তুমি আছ — সেই তাহার মা কাঁঠাল-বিচি ধুইতেছে— কিন্তু অপু কোথায়? সে যেন কর্পূরের মতো উবিয়া গেল! কেবল ঠিক সেইসময়ে দুর্গা বাড়ি ঢুকিতে দরজার কাছে তাহাকে পাশ কাটাইয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্মিতসুরে ডাকিয়া বলিল—ও অপু, কোথায় যাচ্ছিস অমন করে, কী হয়েচে, ও অপু শোন—

তাহার মা বলিল, — জানিনে আমি, যত সব অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড বাপু তোমাদের, হাড়মাস কালি হয়ে

গেল— কী এক পথের মাঝখানে টাঙিয়ে রেখেচে, আসছি, ছিঁড়ে গেল তা — এখন কী হবে? আমি কি ইচ্ছে করে ছিঁড়িছি? তাই ছেলের রাগ — আমি ভাত খাব না — না খাস যা, ভাত খেয়ে সব একেবারে স্বগ্‌গে ঘণ্টা দেবে কিনা তোমরা?

মাতাপুত্রের এরূপ অভিমানের পালায় দুর্গাকেই মধ্যস্থ হইতে হয়— সে অনেক ডাকাডাকির পরে বেলা দুইটার সময় ভাইকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সে শুষ্কমুখে উদাস-নয়নে ও পাড়ার পথে রায়েদের বাগানে পড়ন্ত আমগাছের গুঁড়ির উপর বসিয়াছিল।

বৈকালে যদি কেহ অপুদের বাড়ি আসিয়া তাহাকে দেখিত তবে সে কখনোই মনে করিতে পারিত না যে, এ সেই অপু — যে আজ সকালে মায়ের উপর অভিমান করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিল। অপু বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, কিছুই বাকি নাই, ঠিক যেন একেবারে সত্যিকার রেলরাস্তার তার।

সে সতুদের বাড়ি গিয়া বলিল— সতুদা, আমি টেলিগিরাপের তার টাঙিয়ে রেখেছি আমাদের বাড়ির উঠোনে, চলো রেল রেল খেলা করি— আসবে?

— তার কে টাঙিয়ে দিলেরে?

— আমি নিজে টাঙালাম। দিদি ছোটা এনে দিয়েছিল—

সতু বলিল— তুই খেলগে যা, আমি এখন যেতে পারব না-অপু মনে মনে বুঝিল বড়ো ছেলেদের ডাকিয়া দল বাঁধিয়া খেলার জোগাড় করা তাহার কর্ম নয়। কে তাহার কথা শুনিবে? তবুও আর একবার সে সতুর কাছে গেল। নিরাশ মুখে রোয়াকের কোণটা ধরিয়া নিরুৎসাহভাবে বলিল — চলো না সতুদা, যাবে? তুমি আমি দিদি খেলব এখন? পরে সে প্রলোভনজনক ভাবে বলিল— আমি টিকিটের জন্য এতগুলো বাতাবি নেবুর পাতা তুলে এনে রেখেচি। সে হাত ফাঁক করিয়া পরিমাণ দেখাইল। —যাবে?

সতু আসিতে চাহিল না। অপু বাহিরে বড়ো মুখ-চোরা, সে আর কিছু না বলিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেল। দুঃখে তার চোখে প্রায় জল আসিতেছিল— এত করিয়া বলিতেও সতুদা শুনিল না!

পরদিন সকালে সে ও তাহার দিদি দুজনে মিলিয়া ইট দিয়া একটা বড়ো দোকানঘর বাঁধিয়া জিনিসপত্রের জোগাড়ে বাহির হইল। দুর্গা বনজঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যের সন্ধান বেশি রাখে— দুজনে মিলিয়া নোনাপাতার পান, মেটে-আলু, ফলের আলু, রাধালতা ফুলের মাছ, তেলাকুচার পটল, চিচ্চিড়ের বরবটি, মাটির ঢেলার সৈন্ধব লবণ— আরও কত কী সংগ্রহ করিয়া আসিয়া দোকান সাজাইতে বড়ো বেলা করিয়া ফেলিল। অপু বলিল —চিনি কীসে করবি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—বাঁশতলার পথে সেই ঢিবিটায় ভালো বালি আছে—মা চালভাজা ভাজবার জন্যে আনে! সেই বালি চল্ আনি গে— সাদা চক্‌চক্ কচ্ছে — ঠিক একেবারে চিনি—

বাঁশবনে চিনি খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা পথের ধারের বনের মধ্যে ঢুকিল। খুব উঁচু একটা বন চটকা গাছের আগডালে একটা বড়ো লতার ঘন সবুজ আড়ালে, টুকটুকে রাঙা, বড়ো বড়ো সুগোল কী ফল দুলিতেছে! অপু ও দুর্গা দুজনেই দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অনেক চেষ্টায় গোটা কয়েক ফলসুদ্ধ

নীচের দিকে লতার খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া তলায় পড়িতেই মহা আনন্দে দুজনে একসঙ্গে ছুটিয়া গিয়া সেগুলিকে মাটি হইতে তুলিয়া লইল।

পাকা ফল মোটে তিনটি। প্রধানত বিপণি-সজ্জার উদ্দেশ্যেই তাহা দোকানে এরূপভাবে রক্ষিত হইল যে খরিদ্দার আসিলে প্রথমেই যেন নজরে পড়ে। পুরাদমে বেচাকেনা আরম্ভ হইয়া গেল। দুর্গা নিজেই পান কিনিয়া পান প্রায় ফুরাইয়া ফেলিল। খেলা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় সদর দরজা দিয়া সতুকে ঢুকিতে দেখিয়া অপু মহা আনন্দে তাহাকে আগাইয়া আনিতে দৌড়িইয়া গেল — ও সতুদা, দ্যাখো না কীরকম দোকান হয়েচে, কেমন ফল দ্যাখো? আমি আর দিদি পেড়ে আনলাম— কী ফল বলো দিকি? জানো?

সতু বলিল — ও তো মাকাল ফল— আমাদের বাগানে ক-ত ছিল!

সতু আসিতে অপু যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সতুদা তাহাদের বাড়িতে তো বড়ো একটা আসে না— তাছাড়া সতুদা ছেলেদের দলের চাঁই। সে আসাতে খেলার ছেলেমানুষিটুকু যেন ঘুচিয়া গেল!

অনেকক্ষণ পুরা মরশুমে খেলা চলিবার পর দুর্গা বলিল— ভাই আমাকে দু-মন চাল দাও, খুব সরু, কাল আমার পুতুলের বিয়ের পাকা দেখা, অনেক লোক খাবে—

সতু বলিল—আমাদের বুঝি নেমতন্ন, না?

দুর্গা মাথা দুলাইয়া বলিল— তা বইকি? তোমরা তো হলে কনেযাত্রী—কাল সকালে এসে নকুতো করে নিয়ে যাব—সতুদা রানুকে বলবে আজ রাত্তিরে যেন একটু চন্দন বেটে রাখে? কাল সকালে নিয়ে আসব—

দুর্গার কথা ভালো করিয়া শেষ হয় নাই এমন সময় সতু দোকানে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত পণ্যের মধ্য হইতে কী-একটা তুলিয়া লইয়া হঠাৎ দৌড় দিয়া দরজার দিকে ছুটিল— সঙ্গে সঙ্গে অপুও, ওরে দিদি রে— নিয়ে গেল রে — বলিয়া তাহার রিনরিনে তীব্র মিষ্ট গলায় চিৎকার করিতে করিতে তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল!

বিস্মিত দুর্গা ভালো করিয়া ব্যাপারটা কী বুঝিবার আগেই সতু ও অপু দৌড়াইয়া দরজার বাহির হইয়া চলিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে খেলাঘরের দিকে চোখ পড়িতেই দুর্গা দেখিল সেই পাকা মাকাল ফল তিনটির একটিও নাই!...

দুর্গা একছুটে দরজার কাছে আসিয়া দেখিল সতু গাবতলার পথে আগে আগে ও অপু তাহা হইতে অল্প নিকটে পিছু পিছু ছুটিতেছে। সতুর বয়স অপুর চেয়ে তিন চারি বৎসরের বেশি, তাহা ছাড়া সে অপুর মতো ওরকম ছিপছিপে মেয়েলি গড়নের ছেলে নয়— বেশ জোরালো হাত-পা-ওয়ালা ও শক্ত — তাহার সহিত ছুটিয়া অপুর পারিবার কথা নয় — তবুও যে সে ধরি-ধরি করিয়া তুলিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, সতু ছুটিতেছে পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া এবং অপু ছুটিতেছে প্রাণের দায়ে।

হঠাৎ দুর্গা দেখিল যে সতু ছুটিতে ছুটিতে পথে একবারটি যেন নীচু হইয়া পিছনে ফিরিয়া চাহিল — সঙ্গে সঙ্গে অপুও হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল—সতু ততক্ষণে ছুটিয়া দৃষ্টির বাহির হইয়া চালতেতলার পথে গিয়া পড়িয়াছে।

দুর্গা ততক্ষণে দৌড়িয়া গিয়া অপুর কাছে পৌঁছিল। অপু একদম চোখ বুজিয়া একটু সামনের দিকে নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া দুই হাতে চোখ রগড়াইতেছে — দুর্গা বলিল— কী হয়েচে রে অপু?

অপু ভালো করিয়া চোখ না চাহিয়াই যন্ত্রণার সুরে দু-হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, — সতুদা চোখে ধুলো ছুড়ে মেরেচে— দিদি—চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি নারে—

দুর্গা তাড়াতাড়ি অপুর হাত নামাইয়া বলিল— সর সর দেখি — ওরকম করে চোখ রগড়াসনে, দেখি?

অপু তখনি দু-হাত আবার চোখে উঠাইয়া আকুল সুরে বলিল—উহুঁ ও দিদি— চোখের মধ্যে কেমন হচ্ছে — আমার চোখ কানা হয়ে গিয়েছে দিদি—

—দেখি দেখি ওরকম করে চোখে হাত দিসনে —সর — পরে সে কাপড়ের ফুঁপাড়িয়া চোখে ভাপ দিতে লাগিল। কিছু পরে অপু একটু চোখ মেলিয়া চাহিতে লাগিল— দুর্গা তাহার চোখের পাতা তুলিয়া অনেকবার ফুঁ দিয়া বলিল— এখন বেশ দেখতে পাচ্ছিস? — আচ্ছা তুই বাড়ি যা... আমি ওদের বাড়ি গিয়ে ওর মাকে আর ঠাক্‌মাকে সব বলে দিয়ে আসচি— রানুকেও বলব — আচ্ছা দুষ্টু ছেলে তো — তুই যা আমি আসছি এখ্‌খুনি—

রানুদের খিড়কি দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া দুর্গা কিন্তু যাইতে সাহস করিল না। সেজোঠাকরুনকে সে ভয় করে। খানিকক্ষণ খিড়কির কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিয়া সে বাড়ি ফিরিল। সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া সে দেখিল অপু দরজার বাম ধারের কবাটখানি সামনে ঠেলিয়া দিয়া তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। সে ছিঁচকাদুনে ছেলে নয়, বড়ো কিছুতেই সে কখনও কাঁদে না — রাগ করে বটে, অভিমান করে বটে, কিন্তু কাঁদে না। দুর্গা বুঝিল আজ তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে, অতি সাধের ফলগুলি গেল... তাহা ছাড়া আবার চোখে ধুলা দিয়া এরূপ অপমান করিল! অপুর কান্না যে সে সহ্য করিতে পারে না— তাহার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে।

সে গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল—সান্ত্বনার সুরে বলিল কাঁদিসনে অপু, আয় তোকে আমার সেই কড়িগুলো সব দিচ্চি—আয় — চোখে কি আর ব্যথা বাড়চে?... দেখি, কাপড়খানা বুঝি ছিঁড়ে ফেলেচিস?

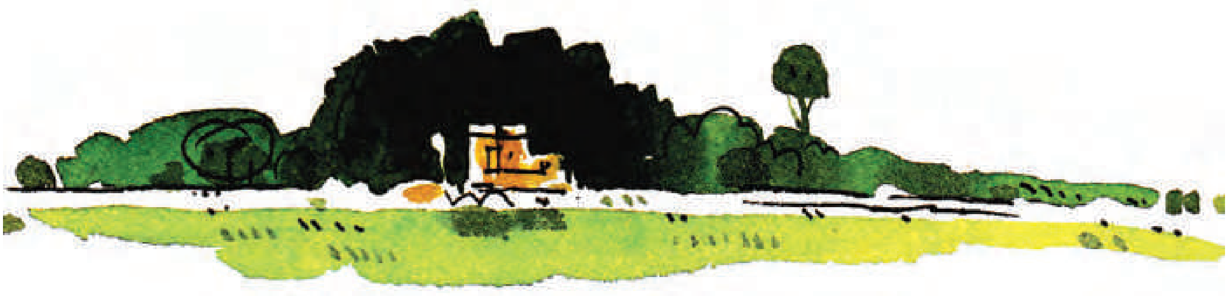

১১

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা অপু কোথাও বাহির না হইয়া ঘরে থাকে। অনেকদিনের জীর্ণ পুরাতন কোঠা-বাড়ির পুরাতন ঘর। জিনিসপত্র, কাঠের সেকালের সিন্দুক, কটা রং-এর সেকালের বেতের প্যাঁটরা কড়ির আলনা জলচৌকিতে ঘর ভরানো। এমন সব বাক্স আছে যাহা অপু কখনও খুলিতে দেখে নাই, তাহাতে রক্ষিত সব হাঁড়ি কলসি আছে, যাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সবসুদ্ধ মিলিয়া ঘরটিতে পুরানো জিনিসের কেমন একটি পুরোনো পুরোনো গন্ধ বাহির হয় —সেটা কীসের গন্ধ সে জানে না, কিন্তু সেটা যেন বহু অতীত কালের কথা মনে আনিয়া দেয়। সে অতীত দিনে অপু ছিল না, কিন্তু এই কড়ির আলনা ছিল, ওই ঠাকুরদাদার বেতের ঝাঁপিটি ছিল, ওই বড়ো কাঠের সিন্দুকটা ছিল, ওই যে সোঁদালি গাছের মাথা বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আছে, ওই পোড়ো জঙ্গলে-ভরা জায়গাটাতে কাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, আরও কত নামের কত ছেলেমেয়ে এই ভিটাতে খেলিয়া বেড়াইত, কোথায় তারা ছায়া হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, কতকাল আগে!

যখন একা ঘরে থাকে, মা ঘাটে যায়— তখন তাহার অত্যন্ত লোভ হয় ওই বাক্সটা বেতের ঝাঁপিটা খুলিয়া দিনের আলোয় বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে কী অদ্ভুত রহস্য উহাদের মধ্যে গুপ্ত আছে। ঘরের আড়ার সর্বোচ্চ তাকে কাঠের বড়ো বারকোসে যে তালপাতার পুঁথির স্তূপ ও খাতাপত্র আছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল সেগুলি তাহার ঠাকুরদাদা রামচাঁদ তর্কালঙ্কারের— তাহার বড়ো ইচ্ছা ওইগুলি যদি হাতের নাগালে ধরা দেয়, তবে সে একবার নীচে নামাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। এক একদিন বনের ধারে জানালাটায় বসিয়া দুপুরবেলা সে সেই ছেঁড়া কাশীদাসের মহাভারতখানা লইয়া পড়ে, সে নিজেই খুব ভালো পড়িতে শিখিয়াছে, আগেকার মতো আর মুখে শুনিতে হয় না, নিজেই জলের মতো পড়িয়া যায় ও বুঝিতে পারে। পড়াশুনায় তাহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, তাহার বাবা মাঝে মাঝে তাহাকে গাঙ্গুলিবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধদের মজলিশে লইয়া যায়, রামায়ণ কী পাঁচালি পড়িতে দিয়া বলে, পড়ো তো বাবা, এঁদের একবার শুনিয়ে দাও তো। বৃদ্ধেরা খুব তারিফ করেন,পুত্রগর্বে হরিহরের বুক ভরিয়া যায়।

তাহাদের ঘরের জানালার কয়েক হাত দূরেই বাড়ির পাঁচিলের ওপাশ হইতেই পাঁচিলের গা ঘেঁষিয়া কী বিশাল আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে! জানালায় বসিয়া শুধু চোখে পড়ে সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ভাঁট-শ্যাওড়া গাছের মাথাগুলো, এগাছে এগাছে দোদুল্যমান কত রকমের লতা, প্রাচীন বাঁশঝাড়ের শীর্ষ বয়সের ভারে যেখানে সোঁদালি, বন-চালতা গাছের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার নীচের কালো মাটির বুকে খঞ্জন পাখির নাচ!

তাহাদের বাড়ির ধার হইতে এ বনজঙ্গল একদিকে সেই কুঠির মাঠ, অপর দিকে নদীর ধার পর্যন্ত একটানা চলিয়াছে। অপুর কাছে এ বন অফুরন্ত ঠেকে, সে দিদির সঙ্গে কতদূর এ বনের মধ্যে তো বেড়াইয়াছে, বনের শেষ দেখিতে পায় নাই — শুধু এইরকম তিত্তিরাজ গাছের তলা দিয়া পথ, মোটা মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো থোলো থোলো বনচালতার ফল চারিধারে। সুঁড়ি পথটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এ গাছের ও গাছের তলা দিয়া বন-কলমি,নাটা-কাঁটা, ময়না-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় সেই ত্রিশূন্যে দোলে, প্রাচীন শিরীষ গাছের শেওলা-ধরা ডালের গায়ে পরগাছার ঝাড় নজরে আনে!

এই বন তার শ্যামলতার নবীন স্পর্শটুকু তার আর তার দিদির মনে বুলাইয়া দিয়াছিল। জন্মিয়া অবধি এই বন তাহাদের সুপরিচিত, প্রতি পলের প্রতি মূহুর্তের নীরব আনন্দে তাহাদের পিপাসুহৃদয় কত বিচিত্র কত অপূর্ব রসে ভরিয়া তোলে।

এই বনের মধ্যে কোথায় একটি মজা পুরানো পুকুর আছে, তারই পাড়ে যে ভাঙা মন্দিরটা আছে, আজকাল যেমন পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, কোনো সময় ওই মন্দিরের বিশালাক্ষীদেবী সেইরকম ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা, এক সময়ে কী বিষয়ে সফল মনস্কাম হইয়া তাঁহারা দেবীর মন্দিরে নরবলি দেন, তাহাতে রুষ্টা হইয়া দেবী স্বপ্নে জানাইয়া যান যে তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, আর কখনও ফিরিবেন না। অনেক কালের কথা, বিশালাক্ষী পূজা হইতে দেখিয়াছে এরূপ কোনো লোক আর জীবিত নাই, মন্দির ভাঙিয়া-চুরিয়া গিয়াছে, মন্দিরের সম্মুখের পুকুর মজিয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে, চারিধার বনে ছাইয়া ফেলিয়াছে; মজুমদার বংশে বাতি দিতে আর কেহ নাই।

কেবল—সেও অনেকদিন আগে — গ্রামের স্বরূপ চক্রবর্তী ভিন-গাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলেন—সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে নামিয়া আসিতে পথের ধারে দেখিলেন একটি সুন্দরী ষোড়শী মেয়ে দাঁড়াইয়া। স্থানটি লোকালয় হইতে দূরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পথে কেহ কোথাও নাই, এ সময় নিরালা বনের ধারে একটি

অল্পবয়সি সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া স্বরূপ চক্রবর্তী দস্তুরমতো বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা কহিবার পূর্বেই মেয়েটি ঈষৎ গর্বমিশ্রিত অথচ মিষ্টসুরে বলিল— আমি এ গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী। গ্রামে অল্পদিনে ওলাওঠার মড়ক আরম্ভ হবে —বলে দিয়ো চতুর্দশীর রাত্রে পঞ্চানন্দতলায় একশো আটটা কুমড়ো বলি দিয়ে যেন কালীপুজো করে। কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্তম্ভিত স্বরূপ চক্রবর্তীর চোখের সামনে মেয়েটি চারিধারের শীত-সন্ধ্যায় কুয়াশায় ধীরে ধীরে যেন মিলাইয়া গেল। এই ঘটনার দিন-কয়েক পরে সত্যই সেবার গ্রামে ভয়ানক মড়ক দেখা দিয়াছিল।

এসব গল্প কতবার শুনিয়াছে। জানালার ধারে দাঁড়াইলেই বিশালাক্ষী ঠাকুরের কথা তাহার মনে ওঠে। দেবী বিশালাক্ষীকে একটিবার দেখতে পাওয়া যায় না? হঠাৎ সে বনের পথে হয়তো গুলঞ্চের লতা পাড়িতেছে — সেইসময়—

খুব সুন্দর দেখিতে, রাঙা-পাড় শাড়ি পরনে, হাতে-গলায় মা-দুর্গার মতো হার, বালা।

—তুমি কে!

—আমি অপু।

—তুমি বড়ো ভালো ছেলে, কী বর চাও?

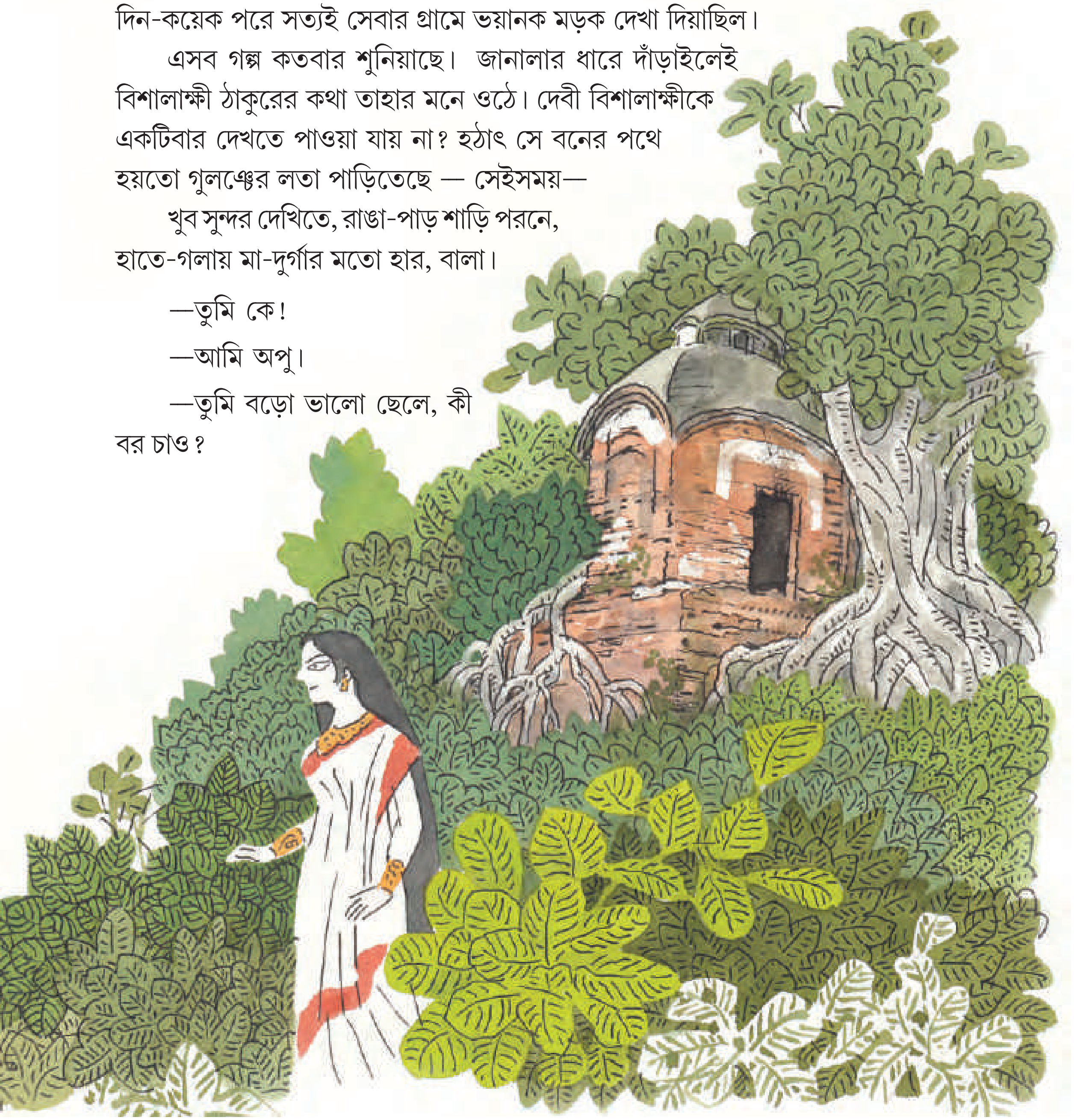

সে বিছানায় গিয়া শোয়। এক একবার ঝিরঝিরে হাওয়ায় কত কী লতাপাতার তিক্তমধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে, ঠিক দুপুরবেলা অনেক দূরের কোনো বড়ো গাছের মাথার উপর হইতে গাঙচিল টানিয়া টানিয়া ডাকে, যেন এই ছোট্ট গ্রামখানির অতীত ও বর্তমান সমস্ত ছোটো-খাটো দুঃখ শান্তি-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে, শরৎ-মধ্যাহ্নের রৌদ্রভরা, নীল-নির্জন আকাশপথে, এক উদাস, গৃহ-বিবাগী পথিক দেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছে।

কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে বুঝিতে পারে না, ঘুমাইয়া উঠিয়া দেখে বেলা একেবারে নাই। জানালার বাহিরে সারা বনটায় ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, বাঁশঝাড়ের আগায় রাঙা রোদ।

প্রতিদিন এই সময়ে — ঠিক এই ছায়া-ভরা বৈকালটিতে নির্জন বনের দিকে চাহিয়া তাহার অতি অদ্ভুত কথা সব মনে হয়! অপূর্ব খুশিতে মন ভরিয়া ওঠে, মনে হয় এরকম লতাপাতার মধুর গন্ধভরা দিনগুলি ইহার আগে কবে একবার যেন আসিয়াছিল, সেসব দিনের অনুভূত আনন্দের অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া এই দিনগুলিকে ভবিষ্যতের কোনো অনির্দিষ্ট আনন্দের আশায় ভরিয়া তোলে। মনে হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে, এ দিনগুলি বুঝি বৃথা যাইবে না — একটা বড়ো কোনো আনন্দ ইহাদের শেষে অপেক্ষা করিয়া আছে যেন!

অপূর্ব, অদ্ভুত বৈকালটা... নিবিড় ছায়াভরা গাছপালার ধারে খেলাঘর... গুলঞ্চলতার তার টাঙানো খেজুর ডালের ঝাঁপ... বনের দিক হইতে ঠান্ডা ঠান্ডা গন্ধ বাহির হয়... রাঙা রোদটুকু জ্যেঠামহাশয়দের পোড়ো ভিটায় বাতাবিলেবুর গাছের মাথায় চিকচিক করে... চকচকে বাদামি রং-এর ডানাওয়ালা তেড়ো পাখি বনকলমি ঝোপে উড়িয়া আসিয়া বসে... তাজা মাটির গন্ধ... ছেলেমানুষের জগৎ — ভরপুর আনন্দে উছলিয়া ওঠে, কাহাকে সে কী করিয়া বুঝাইবে সে কী আনন্দ!

১২

সন্ধ্যার পর সর্বজয়া ভাত চড়াইয়াছিল! অপু দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছে। খুব অন্ধকার, একটানা ঝিঁঝিপোকা ডাকিতেছে।

অপু জিজ্ঞাসা করিল— পুজোর আর কদিন আছে, মা?

দুর্গা বঁটি পাতিয়া তরকারি কাটিতেছিল। বলিল, — আর বাইশ দিন আছে, না মা?

সে হিসাব ঠিক করিয়াছে। তাহার বাবা বাড়ি আসিবে, অপুর, মায়ের, তাহার জন্য পুতুল, কাপড়, আলতা। দুর্গার মন আজ খুব খুশি আছে। রাত্রিতে রান্না প্রায়ই হয় না, ওবেলার বাসি ভাত তরকারি

থাকে। আজ ভাত চড়িয়াছে, তরকারি রান্না হইবে, ইহাতে তাহার মহা আনন্দ। আজ যেন একটি উৎসবের দিন। দুর্গা বলিল—আজ কী হয়েছে জানো মা —

অপু বলিল — যাঃ তাহলে তোর সঙ্গে আড়ি করব, বলে দ্যাখ —

— করগে যা আড়ি— শোনো মা, ও পোস্তদানার নাম জানে না, আজ রাজীদের বাড়ি পোস্তদানা রোদ্দুরে দিয়েচে, ও বল্লে, কী রাজীদি? রাজী বল্লে, যষ্টিমধু, খেয়ে দ্যাখ — ও খেয়ে এল মা সেখানে দাঁড়িয়ে, বুঝতেও পাল্লে না যে পোস্ত — এমন বোকা — না মা?

অপু মুখে বলিল বটে কিন্তু দিদির সহিত সে আড়ি করিবে না। সেই যে যেদিন তাহার মাকাল ফলগুলো সতুদা লইয়া পলাইয়াছিল, সেদিন তাহার দিদি সারাদিন বন বাগান খুঁজিয়া সন্ধ্যার সময় কোথা হইতে আঁচলে বাঁধিয়া এক রাশ মাকাল ফল আনিয়া তাহার সম্মুখে খুলিয়া দেখাইয়া বলিয়াছিল — কেমন, হলো এখন? বড্ড যে কাঁদছিলি সকালবেলা? সে-সন্ধ্যায় কিসে সে বেশি আনন্দ পাইয়াছিল — মাকাল ফলগুলো হইতে কি, দিদির মুখের বিশেষ করিয়া তাহার ডাগর চোখের মমতাভরা স্নিগ্ধ হাসি হইতে — তাহা সে জানে না।

খাইতে বসিয়া দুর্গা বলিল — পাতালকোঁড়ের তরকারিটা কী সুন্দর খেতে হয়েচে মা! তাহার মুখ স্বর্গীয় তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে অপুও বলিল — বাঃ! খেতে ঠিক মাংসের মতো, না দিদি? পাতালকোঁড় এক জায়গায় কত ফুটে আছে মা, আমি ভাবি ব্যাঙের ছাতা, তাই তুলিনে—। উভয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্যে সর্বজয়ার বুক গর্বে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তবুও কি আর উপযুক্ত উপকরণ সে পাইয়াছে?

তাহার পরে সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হয়, ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের আঁচ-লাগা শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু ভরিয়া যায়।

১৩

অপু সেদিন জেলেপাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়াছিল। বেলা দুইটা বা আড়াইটার কম নয়, রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর। প্রথমে সে তিনকড়ি জেলের বাড়ি গেল। তিনকড়ির ছেলে বঙ্কা পেয়ারাতলায় বাখারি চাঁচিতেছিল; অপু বলিল — এই কড়ি খেলবি! খেলিবার ইচ্ছা থাকিলেও বঙ্কা বলিল তাহাকে এখনি নৌকায় যাইতে হইবে, খেলা করিতে গেলে বাবা বকিবে! সেখান হইতে সে গেল রামচরণ জেলের বাড়ি। রামচরণ দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল; অপু বলিল — হৃদয় বাড়ি আছে? রামচরণ বলিল... হৃদয় কেন ঠাকুর? কড়ি খেলা বুঝি? এখন যাও হৃদে বাড়ি নেই।

ঠিক দুপুরবেলায় ঘুরিয়া অপুর মুখ রাঙা হইয়া গেল। আরও কয়েক স্থানে বিফল মনোরথ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বাবুরাম পাড়ুইয়ের বাড়ির নিকটবর্তী তেঁতুলতলার কাছে আসিয়া তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তেঁতুলতলায় কড়িখেলার আড্ডা খুব জমিয়াছে। সকলেই জেলেপাড়ার ছেলে, কেবল ব্রাহ্মণপাড়ার ছেলের মধ্যে আছে পটু। অপুর সঙ্গে পটুর তেমন আলাপ নাই, কারণ পটুর যে পাড়ায় বাড়ি, অপুদের বাড়ি হইতে তাহা অনেক দূর। অপুর চেয়ে বয়সে পটু কিছু ছোটো; অপুর মনে আছে, প্রথম যেদিন সে প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায় ভরতি হইতে যায়, সেদিন এই ছেলেটিকেই সে শান্তভাবে বসিয়া তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতে দেখিয়াছিল। পটু কড়ির গেঁজে বাহির করিয়া দেখাইল। রাঙা সূতার বুনানি ছোটো গেঁজেটি — তাহার অত্যন্ত শখের জিনিস। বলিল, সতেরোটা এনেচি — সাতটা সোনা গোঁটে; হেরে গেলে আরো আনব। ... পরে গেঁজেটা দেখাইয়া হাসিমুখে কহিল কেমন দেখচিস? গেঁজেটায় একপণ কড়ি ধরে।

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমটা পটু হারিতেছিল, পরে জিতিতে শুরু করিল। কয়েকদিন মাত্র আগে পটু আবিষ্কার করিয়াছে যে, কড়ি খেলায় তাহার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ হইয়া উঠিয়াছে; সেইজন্যই সে দিগ্বিজয়ের উচ্চাশায় প্রলুব্ধ হইয়া এতদূর আসিয়াছিল। খেলার নিয়মানুসারে পটু উপর হইতে টুক করিয়া বড়ো কড়ি দিয়া তাক ঠিক করিয়া মারিতেই যেমন একটা কড়ি বোঁ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়, অমনি পটুর মুখ অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। পরে সে জিতিয়া-পাওয়া কড়িগুলি তুলিয়া গেঁজের মধ্যে পুরিয়া লোভে ও আনন্দে বারবার গেঁজেটির দিকে চাহিয়া দেখে, সেটি ভরতি হইতে আর কত বাকি!

কয়েকজন জেলের ছেলে কী পরামর্শ করিল। একজন পটুকে বলিল— আর একহাত তফাত থেকে তোমায় মারতে হবে ঠাকুর, তোমার হাতে টিপ বেশি।

পটু বলিল — বারে, তা কেন, টিপ বেশি থাকাটা দোষ বুঝি? তোমরাও জেতো না, আমি তো কাউকে বারণ করিনি।

পরে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল জেলের ছেলেরা সব একদিকে হইয়াছে। পটু ভাবিল — এত বেশি কড়ি আমি কোনোদিন জিতিনি; আজ আর খেলচি নে, — খেললে কি আর এই কড়ি বাড়ি নিয়ে যেতে পারব? আবার একহাত বাধ্ বেশি! সব হেরে যাব। হঠাৎ সে কড়ির ছোট্ট থলিটি হাতে লইয়া বলিল— আমি একহাত বেশি নিয়ে খেলব না, আমি বাড়ি যাচ্ছি। .... পরে জেলে ছেলেদের ভাবভঙ্গি ও চোখের নিষ্ঠুর দৃষ্টি দেখিয়া সে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের কড়ির থলিটি শক্ত মুঠায় চাপিয়া রাখিল।

একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল — তা হবে না ঠাকুর, কড়ি জিতে পালাবে বুঝি? .... সঙ্গে সঙ্গে সে হঠাৎ পটুর থলিসুদ্ধ হাতটা চাপিয়া ধরিল। পটু ছাড়াইয়া লইতে গেল, কিন্তু জোরে পারিল না; বিষণ্ণ মুখে বলিল — বা রে, ছেড়ে দাও না আমার হাত! — পিছন হইতে কে একজন তাহাকে ঠেলা মারিল; সে পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু কড়ির থলি ছাড়িল না। সে বুঝিয়াছে এইটিই কাড়িবার জন্য ইহাদের চেষ্টা! পড়িয়া গিয়া সে প্রাণপণে থলিটা পেটের কাছে চাপিয়া রাখিতে গেল; কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ, তাহাতে গায়ের জোরও কম, জেলেপাড়ার বলিষ্ঠ ও তাহার চেয়ে বয়সে বড়ো ছেলেদের সঙ্গে কতক্ষণ যুঝিতে পারবে! হাত হইতে কড়ির থলিটি অনেকক্ষণ কোন ধারে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল— কড়িগুলি চারিধারে ছত্রাকার হইয়া গেল।

অপু প্রথমটা পটুর দুর্দশায় একটু খুশি না হইয়াছিল তাহা নহে, কারণ সে-ও অনেক কড়ি হারিয়াছে। কিন্তু পটুকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, বিশেষ করিয়া তাহাকে অসহায়ভাবে পড়িয়া মার খাইতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, সে ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গিয়া বলিল — ছেলেমানুষ ওকে তোমরা মারচ কেন? বা রে, ছেড়ে দাও— ছাড়ো! পরে সে পটুকে মাটি হইতে উঠাইতে গেল, কিন্তু পিছন হইতে কাহার হাতের ঘুসি খাইয়া খানিকক্ষণ সে চোখে কিছু দেখিতে পাইল না, তারপর ঠেলাঠেলিতে সে ও মাটিতে পড়িয়া গেল।

বাড়ি ঢুকিয়াই অপু দুর্গাকে বলিল— দিদি, শিউলিতলায় গুঁড়ির কাছে আমি একটা বাঁকা কঞ্চি রেখে গিইছি, আর তুই বুঝি সেটাকে ভেঙে দু-খণ্ড করে রেখেচিস?

দুর্গা সেখানাকে ভাঙিয়াছিল ঠিকই। — আহা, ভারি তো একখানা বাঁকা কঞ্চি! তোর যত পাগলামি — বাঁশবাগানে খুঁজলে কঞ্চি আর মিলবে না বুঝি! কঞ্চির ভারি অমিল কিনা।

অপু লজ্জিত মুখে বলিল — অমিল না তো কি? তুই এনে দে দিকি ওইরকম একখানা কঞ্চি। আমি কত খুঁজেপেতে নিয়ে আসব, আর তুই সব ভেঙে-চুরে রাখবি— বেশ তো!

তার চোখে জল আসিয়া গেল।

দুর্গা বলিল — দেবো এনে যত চাস, কান্না কীসের!

বাঁকা-কঞ্চি অপুর জীবনে এক অদ্ভুত জিনিস! একখানা শুকনো, হালকা, গোড়ার দিক মোটা, আগার দিক সরু, বাঁকা কঞ্চি হাতে করিলেই অপুর মন পুলকে শিহরিয়া ওঠে, মনে অদ্ভুত সব কল্পনা জাগে। একখানা বাঁকা কঞ্চি হাতে করিয়া এক একদিন সে সারা সকাল কী বৈকাল আপন মনে বাঁশবনের পথে কী নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়ায়, কখনও রাজপুত্র, কখনও তামাকের দোকানি, কখনও ভ্রমণকারী, কখনও বা সেনাপতি, কখনও মহাভারতের অর্জুন — কল্পনা করে এবং আপন মনে বিড়বিড় করিয়া কাল্পনিক ঘটনা যাহা ওই অবস্থায় তাহার জীবনে ঘটিলে তাহার আনন্দ হইত, সেইসব ঘটনা বলিয়া যায়। কঞ্চি যত মনের মতো হালকা হইবে ও পরিমাণ মতো বাঁকা হইবে তাহার আনন্দ ও কল্পনা ততই পরিপূর্ণতা লাভ করে; কিন্তু সেরকম কঞ্চি সংগ্রহ করা যে কত শক্ত অপু তাহা বোঝে। কত খুঁজিয়া তবে একখানা মেলে।

অপু যে বাঁকা-কঞ্চি হাতে এরকম করিয়া বেড়ায়, একথা কেউ না শুনিতে পারে অপুর সেদিকে অত্যন্ত চেষ্টা। এরূপ অবস্থায় লোকে তাহাকে আপন মনে বকিতে দেখিলে পাগল ভাবিবে বা অন্য কিছু মনে করিবে, এই আশঙ্কায় সে পারতপক্ষে জনসমাগমপূর্ণ স্থানে অথবা যেদিকে কেহ হঠাৎ আসিয়া পড়িতে পারে, সেসব দিকে না গিয়া নদীর ধারে — নির্জন বাঁশবনের পথে— নিজেদের বাড়ির পিছনে তেঁতুলতলায় ঘোরে। এ অবস্থায় তাহাকে কেহ না দেখে, সেদিকে তাহার অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি। ক্বচিৎ যদি কেহ আসিয়া পড়ে, তখনি সে জিভ কাটিয়া হাতের কঞ্চিখানা ফেলিয়া দেয় পাছে কেহ কিছু মনে করে — এজন্য তাহার ভারি লজ্জা।

কেবল জানে তাহার দিদি। তাহাকে এ অবস্থায় দু-একবার দেখিয়া ফেলিয়াছিল, কাজেই দিদির কাছে আর লুকাইয়া কি হইবে? তাই সে বাঁকা কঞ্চির কথা দিদিকে স্পষ্টতই জিজ্ঞাসা করিল। অন্য লোক হইলে, লজ্জায় অপু কখনোই এ কথার উল্লেখ করিতে পারিত না, যদিও কেহই জানে না অপুর সহিত বাঁকা-কঞ্চির কী রহস্যময় সম্পর্ক, তবুও অপুর মনে হয় সকলেই সেকথা জানে বলিয়াই সকলে তাহাকে

পাগল বলিয়া ঠাট্টা করিবে। কে বুঝিবে— একখানা বাঁকা-কঞ্চি হাতে পাইলে, সে না খাইয়া-দাইয়া নদীর ধারে কি কোনো জনহীন বনের পথে কী অপূর্ব আনন্দেই সারাদিন একা-একা কাটাইয়া দিতে পারে।

দিদিকে অনুরোধ করিয়াছিল — মাকে যেন এসব বলিসনে দিদি! দুর্গা বলে নাই। সে জানে, অপু একটা পাগল! ভারি মমতা হয় ওর ওপর, ছোট্ট বোকা আদুরে ভাইটা — এসব মাকে বলিয়া কী হইবে?...

১৪

একদিন সে দুপুরবেলা বাপের অনুপস্থিতিতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চুপি চুপি বইয়ের বাক্সটা লুকাইয়া খুলিল। অধীর আগ্রহের সহিত সে এ-বই ও-বই খুলিয়া খুলিয়া খানিকটা করিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা করিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা করিয়া বইয়ের মধ্যে ভালো গল্প লেখা আছে কিনা দেখিতে লাগিল। একখানা বইয়ের মলাট খুলিয়া দেখিল নাম লেখা আছে 'সর্ব-দর্শন সংগ্রহ'! ইহার অর্থ কী, বইখানা কোন বিষয়ের তাহা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না! বইখানা খুলিতেই একখানা কাগজ-কাটা পোকা নিঃশব্দে বিবর্ণ মার্বেল কাগজের নীচে হইতে বাহির হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে যেদিকে দুই চোখ যায় দৌড় দিল। অপু বইখানা নাকের কাছে লইয়া গিয়া ঘ্রাণ লইল, কেমন পুরানো গন্ধ! মেটে রঙের পুরু পুরু পাতাগুলোর এই গন্ধটা তাহার বড়ো ভালো লাগে — গন্ধটায় কেবলই বাবার কথা মনে করাইয়া দেয়।

লুকাইয়া পড়িতে পড়িতে এই বইখানিতেই একদিন সে পড়িল বড়ো অদ্ভুত কথাটা। হঠাৎ শুনিলে মানুষ আশ্চর্য হইয়া যায় বটে — কিন্তু ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে একথা লেখা আছে, সে পড়িয়া দেখিল। পারদের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে লেখক লিখিয়াছেন,— শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরিয়া কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরিয়া মানুষ ইচ্ছা করিলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।

অপু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না, — আবার পড়িল — আবার পড়িল।

পরে নিজের ডালাভাঙা বাক্সটার মধ্যে বইখানা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে অবাক হইয়া গেল।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করে — শকুনিরা বাসা বাঁধে কোথায় জানিস দিদি?

তাহার দিদি বলিতে পারে না। সে পাড়ার ছেলেদের — সতু, নীলু, কানু, পটল,নেড়া — সকলকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলে সে এখানে নয়; উত্তর মাঠে উঁচুগাছের মাথায়। তাহার মা বকে— এই দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস! অপু ঘরে ঢুকিয়া শুইবার ভান করে, বইখানা খুলিয়া সেই জায়গাটা আবার পড়িয়া দেখে — আশ্চর্য! এত সহজে উড়িবার উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এই বইখানা আর কাহারো বাড়ি নাই, শুধু তাহার বাবারই আছে; হয়তো এই জায়গাটা আর কেহ পড়িয়া দেখে নাই, শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে এতদিনে।

বইখানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আবার সে আঘ্রাণ লয়— সেই পুরানো পুরানো গন্ধটা! এই বইয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোন অবিশ্বাস থাকে না।

পারদের জন্য ভাবনা নাই— পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পেছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়িতে আছে, উহা জোগাড় করিতে পারিবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় পায়?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে এক একদিন তাহার দিদি ডাকে — আয় শোন অপু, মজা দেখবি আয়। পরে সে একমুঠা পাতের ভাত লইয়া বাড়ির খিড়কি দোরের বাঁশবাগানে গিয়া হাঁক দেয় — আয় ভুলো— তু-উ-উ-উ। ডাক দিয়াই দুর্গা ভাইয়ের দিকে হাসি হাসি মুখে চুপ করিয়া থাকে, যেন কী অপূর্ব রহস্যপুরীর দুয়ার এখনই তাহাদের চোখের সামনে খুলিয়া যায়! হঠাৎ কোথা হইতে কুকুরটা আসিয়া পড়িতেই দুর্গা হাত তুলিয়া বলিয়া উঠে — ওই এসেছে! কোত্থেকে এল দেখলি? — খুশিতে সে হি হি করিয়া হাসে।

রোজ রোজ এই কুকুরকে ভাত খাওয়ানোর ব্যাপারে দুর্গার আমোদ হয় ভারি — তুমি হাঁক দেও, কেউ কোথাও নাই, চারিদিকে চুপ! ভাত মাটিতে নামাইয়া দুর্গা চোখ বুজিয়া থাকে, আশা ও কৌতূহলের ব্যাকুলতায় বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে, মনে মনে ভাবে — আজ ভুলো আসবে না বোধহয়, দেখি দিকি কোত্থেকে আসে! আজ কি আর শুনতে পেয়েছে!—

হঠাৎ ঘনঝোপে একটা শব্দ ওঠে—

চক্ষের নিমেষে বনজঙ্গলের লতা-পাতা ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভুলো কোথা হইতে নক্ষত্রবেগে আসিয়া হাজির!

অমনি দুর্গার সমস্ত গা দিয়া একটা কিসের স্রোত বহিয়া যায়! বিস্ময় ও কৌতুকে তাহার মুখ-চোখ উজ্জ্বল দেখায়। মনে মনে ভাবে— ঠিক শুনতে পায় তো, আসে কোত্থেকে! আচ্ছা কাল একটু চুপি চুপি ডেকে দেখব দিকি, তাও শুনতে পাবে?

এই আমোদ উপভোগ করিতে সে মায়ের বকুনি সহ্য করিয়াও রোজ খাইবার সময় নিজে বরং কিছু কম খাইয়া কুকুরের জন্য কিছু ভাত পাতে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

অপু কিন্তু দিদির কুকুর ডাকিবার মধ্যে কী আমোদ আছে তাহা খুঁজিয়া পায় না। দিদির ওসব মেয়েলি ব্যাপারের মধ্যে সে নাই। অধীর আগ্রহে ভোজনরত শীর্ণ কুকুরটার দিকে সে চাহিয়াও দেখে না, শুধু শকুনির ডিমের কথা ভাবে।

অবশেষে সন্ধান মিলিল। হিরু নাপিতের কাঁঠালতলায় রাখালেরা গোরু বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়িতে তেল-তামাক আনিতে যায়। অপু গিয়া তাহাদের পাড়ার রাখালকে বলিল — তোরা কত মাঠে মাঠে বেড়াস, শকুনির বাসা দেখতে পাস? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস আমি দুটো পয়সা দেব।

দিন চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ির সামনে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কোমরের থলি হইতে দুইটা কালো কালো রং-এর ছোটো ছোটো ডিম বাহির করিয়া বলিল— এই দ্যাখো ঠাকুর এনিচি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল, দেখি পরে আহ্লাদের সহিত উলটাইতে পালটাইতে বলিল — শকুনির

ডিম! ঠিক তো? রাখাল সে সম্বন্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণ উত্থাপিত করিল। ইহা শকুনির ডিম কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কোথাকার কোন উঁচু গাছের মগডাল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে — কিন্তু দুই আনার কমে দিবে না।

পারিশ্রমিক শুনিয়া অপু অন্ধকার দেখিল। বলিল, দুটো পয়সা দেবো আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেবো, এক টিনের ঠোঙা কড়ি — সব। এই এত বড়ো বড়ো সোনাগেঁটে — দেখবি? দেখাব?

রাখালকে সাংসারিক বিষয়ে অপুর অপেক্ষা অনেক হুঁশিয়ার বলিয়া মনে হইল। সে নগদ পয়সা ছাড়া কোনো রকমেই রাজি হয় না। অনেক দরদস্তুরের পর আসিয়া চার পয়সায় দাঁড়াইল। অপু দিদির কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুটা পয়সা জোগাড় করিয়া তাহাকে চুকাইয়া দিয়া ডিম দুটি লইল। তাহা ছাড়া রাখাল কিছু কড়িও লইল। এই কড়িগুলা অপুর প্রাণ, অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার বিনিময়েও সে এই কড়ি কখনও হাতছাড়া করিত না অন্য সময়; কিন্তু আকাশে উড়িবার আমোদের কাছে কি আর

বেগুন-বিচি খেলা! ডিমটা হাতে করিয়া তাহার মনটা যেন ফুঁ-দেওয়া রবারের বেলুনের মতো হালকা হইয়া ফুলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা সন্দেহের ছায়া তাহার মনে আসিয়া পৌঁছিল, এটুকু এতক্ষণ ছিল না, ডিম হাতে পাওয়ার পর হইতে যেন কোথা হইতে ওটুকু দেখা দিল খুব অস্পষ্ট। সন্ধ্যার আগে আপন মনে নেড়াদের জামগাছের কাটা গুঁড়ির উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, সত্যি সত্যি উড়া যাইবে তো! সে উড়িয়া কোথায় যাইবে? মামার বাড়ির দেশে? বাবা যেখানে আছে সেখানে? নদীর ওপারে? শালিখ পাখি ময়না পাখির মতো ও-ই আকাশের গায়ে তারাটা যেখানে উঠিয়াছে?...

সেই দিনই, কি তাহার পরদিন। সন্ধ্যার একটু আগে দুর্গা সলিতার জন্য ছেঁড়া নেকড়া খুঁজিতেছিল। তাকে হাঁড়ি-কলসির পাশে গোঁজা সলিতা পাকাইবার ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়ের টুকরার তাল হাতড়াইতে হাতড়াইতে কী যেন ঠক করিয়া তাহার পিছন হইতে গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার, ভালো দেখা যায় না, দুর্গা মেঝে হইতে উঠাইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল — ওমা কীসের দুটো বড়ো বড়ো ডিম এখানে! এঃ, পড়ে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গিয়েচে — দেখেচো কী পাখি ডিম পেড়েচে ঘরের মধ্যে মা!

তাহার পর কী ঘটিল, সে কথা না তোলাই ভালো। অপু সেদিন রাত্রে খাইল না .... কান্না, হই হই কান্ড। তাহার মা ঘাটে গল্প করে — ছেলেটার যে কী কাণ্ড, ওমা এমন কথা তো কখনও শুনিনি — শুনেচো সেজো ঠাকুরঝি, শকুনির ডিম নিয়ে নাকি মানুষ উড়তে পারে— ওই ওদের বাড়ির রাখাল ছোঁড়াটা বদমায়েসের ধাড়ি। তাকে বুঝি বলেচে, সে কোত্থেকে দুটো কাগের না কীসের ডিম এনে বলেচে — এই নেও শকুনের ডিম। তাই নাকি আবার চার পয়সা দিয়ে কিনেচে তার কাছে। ছেলেটা যে কী বোকা সে আর তোমার কাছে কী বলব সেজো ঠাকুরঝি— কী করি যে এ ছেলে নিয়ে আমি।

কিন্তু বেচারি সর্বজয়া কী করিয়া জানিবে, সকলেই তো কিছু ‘সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ’ পড়ে নাই বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না।

আকাশে তাহা হইলে তো সকলেই উড়িত।

১৫

অনেক দিন হইতে গ্রামের বৃদ্ধ নরোত্তম দাস বাবাজির সঙ্গে অপুর বড়ো ভাব। গাঙ্গুলি পাড়ার গৌরবর্ণ, দিব্যকান্তি, সদানন্দ বৃদ্ধ সামান্য খড়ের ঘরে বাস করেন। বিশেষ গোলমাল ভালোবাসেন না, প্রায়ই নির্জনে থাকেন, সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে গাঙ্গুলিদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া বসেন। অপুর বাল্যকাল হইতেই হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া মাঝে মাঝে নরোত্তম দাসের কাছে লইয়া যাইত— সেই হইতেই দুজনের মধ্যে খুব ভাব। মাঝে মাঝে অপু গিয়া বৃদ্ধের নিকট হাজির হয়, ডাক দেয়, — দাদু আছ? বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি

ঘর হইতে বাহির হইয়া তালপাতার চাটাইখানা দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া বলেন — এসো দাদাভাই এসো, বসো বসো —

অন্যস্থানে অপু মুখচোরা, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না — কিন্তু এই সরল শান্তদর্শন বৃদ্ধের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে মিশিয়া থাকে, বৃদ্ধের সঙ্গে তাহার আলাপ, খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপের মতো ঘনিষ্ঠ, বাধাহীন ও উল্লাসভরা!

অনেক সময় সারা বিকাল ধরিয়া অপু বসিয়া বসিয়া গল্প শোনে ও গল্প করে। একথা সে জানে যে নরোত্তম দাস বাবাজি তাহার বাবার অপেক্ষাও বয়সে অনেক বড়ো, অন্নদা রায়ের অপেক্ষাও বড়ো— কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধতার জন্যই অপুর কেমন যেন মনে হয় বৃদ্ধ তাহার সতীর্থ, এখানে আসিলে তাহার সকল সংকোচ সকল লজ্জা আপনা হইতেই ঘুচিয়া যায়। গল্প করিতে করিতে অপু মন খুলিয়া হাসে, এমন সব কথা বলে যাহা অন্যস্থানে সে ভয়ে বলিতে পারে না, পাছে প্রবীণ লোকেরা কেহ ধমক দিয়া 'জ্যাঠা ছেলে' বলে। নরোত্তম দাস বলেন— দাদু, তুমি আমার গৌর, — তোমাকে দেখলে আমার মনে হয় দাদু, আমার গৌর তোমার বয়সে ঠিক তোমার মতোই সুন্দর, সুশ্রী, নিষ্পাপ ছিলেন — ওইরকম ভাবমাখানো চোখ ছিল তাঁরও—

অন্যস্থানে এ কথায় অপুর হয়তো লজ্জা হইত, এখানে সে হাসিয়া বলে। দাদু তাহলে এবার তুমি আমায় সেই বইখানার ছবি দেখাও।

বৃদ্ধ ঘর হইতে 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'-খানা বাহির করিয়া আনেন। তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ, নির্জনে পড়িতে পড়িতে তিনি মুগ্ধ বিভোর হইয়া থাকেন। ছবি মোট দু-খানি, দেখানো শেষ হইয়া গেলে বৃদ্ধ বলেন, আমি মরবার সময়ে বইখানা তোমাকে দিয়ে যাব দাদু, তোমার হাতে বইয়ের অপমান হবে না—

সহজ, সামান্য, অনাড়ম্বর জীবনের গতি-পথ বাহিয়া এখানে কেমন যেন একটা অন্তঃসলিলা মুক্তির ধারা বহিতে থাকে, অপুর মন সেটুকু কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলে! তাহার কাছে তাহা তাজা মাটি পাখি গাছপালা সাহচর্যের মতো অন্তরঙ্গ ও আনন্দপূর্ণ ঠেকে বলিয়াই দাদুর কাছে আসিবার আকর্ষণ তাহার এত প্রবল!

ফিরিবার সময় অপু নরোত্তম দাসের উঠানের গাছতলাটা হইতে একরাশি মুচকুন্দ চাঁপা ফুল কুড়াইয়া আনে। সেগুলি সে বিছানায় রাখিয়া দেয়। তাহার পর সন্ধ্যায় আলো জ্বলিলেই বাবার আদেশে পড়িতে বসিতে হয়। ঘণ্টাখানেকের বেশি কোনোদিনই পড়িতে হয় না, কিন্তু অপুর মনে হয় কত রাতই যে হইয়া গেল! পরে ছুটি পাইয়া সে শুইতে যায়, বিছানায় শুইয়া পড়ে, — আর অমনি আজকার দিনের সকল খেলাধুলা সারাদিন সকল আনন্দের স্মৃতিতে ভরপুর হইয়া বিছানায় রাখা মুচকুন্দ-চাঁপার গন্ধ তাহার ক্লান্ত দেহমনকে খেলাধূলার অতীত ক্ষণগুলির জন্য বিরহাতুর বালক-প্রাণকে অভিভূত করিয়া বহিতে থাকে। বিছানায় উপুড় হইয়া ফুলের রাশির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া সে অনেকক্ষণ ঘ্রাণ লয়।

১৬

সেদিন তাহার দিদি চুপিচুপি বলে— চড়ুইভাতি করবি অপু?

নীলমণি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার ওধারের খানিকটা বন দুর্গা নিজের হাতে দা দিয়া কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ভাইকে বলিল— দাঁড়িয়ে দ্যাখ তেঁতুলতলায় মা আসচে কিনা — আমি চাল বের করে নিয়ে আসি শিগগির করে।

একটা ভালো নারিকেলের মালায় দুই পলা তেল চুপি চুপি তেলের ভাঁড়টা হইতে বাহির করিয়া আনিল। অপহৃত মালামাল বাহিরে আনিয়া ভাইয়ের জিম্মা করিয়া বলিল— শিগগির নিয়ে যা, দৌড়ো অপু — সেইখানে রেখে আয়, দেখিস যেন গোরুটোরুতে খেয়ে ফেলে না।

চারিদিক বনে ঘেরা। বাহির হইতে দেখা যায় না। খেলাঘরের মাটির ছোবার মতো ছোট্ট একটা হাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল — এই দ্যাখ অপু, কত বড়ো বড়ো মেটে আলুর ফল নিয়ে এসিচি এক জায়গা থেকে। পুঁটিদের তালতলায় একটা ঝোপের মাথায় অনেক হয়ে আছে, ভাতে দোবো...

অপু মহা উৎসাহে শুকনা লতা-কাটি কুড়াইয়া আনে। এই তাহাদের প্রথম বনভোজন। অপুর এখনও বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এখানে সত্যিকারের ভাত তরকারি রান্না হইবে, না খেলাঘরের বনভোজন, যা কতবার হইয়াছে, সেরকম হইবে — ধুলার ভাত, খাপরার আলুভাজা, কাঁঠাল পাতার লুচি?

— কিন্তু বড়ো সুন্দর বেলাটি? বড়ো সুন্দর স্থান বনভোজনের! চারিধারে বনঝোপ, ওদিকে তেলাকুচা লতার দুলুনি, বেলগাছের তলে জঙ্গলে শেওড়াগাছের ফুলের ঝাড়, আধপোড়া কটা দূর্বাঘাসের উপর খঞ্জনী পাখিরা নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নির্জন ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে নিভৃত নিরালা স্থানটি। প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে ঝোপে নতুন কচিপাতা, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটাটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে, বাতাবিলেবু গাছটায় কয়দিনের কুয়াশায় ফুল অনেক ঝরিয়া গেলেও থোপা থোপা সাদা সাদা ফুল উপরের ডালে চোখে পড়ে।

চড়ুইভাতির মাঝামাঝি অপুদের বাড়ির উঠানে কাহার ডাক শোনা গেল। দুর্গা বলিল— বিনির গলা যেন — নিয়ে আয় তো ডেকে অপু। একটু পরে অপুর পিছনে দুর্গার সমবয়সি একটি কালো মেয়ে আসিল — একটু হাসিয়া যেন কতকটা সম্ভ্রমের সুরে বলিল— কী হচ্ছে দুর্গাদিদি?

দুর্গা বলিল - আয় না বিনি, চড়ুইভাতি কচ্চি— বোস—

মেয়েটি ওপাড়ার কালীনাথ চক্কত্তির মেয়ে—পরনে আধময়লা শাড়ি, হাতে সরু সরু কাচের চুড়ি, একটু লম্বা গড়ন, মুখ নিতান্ত সাদাসিধা। তাহার বাপ যুগীর বামুন বলিয়া সামাজিক ব্যাপারে পাড়ায় তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় না, গ্রামের একপাশে নিতান্ত সংকুচিতভাবে বাস করে। অবস্থাও ভালো নয়। বিনি দুর্গার ফরমাইজ খাটিতে লাগিল খুব। বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ইহারা তাহাকে সে উৎসবের অংশীদার স্বীকার করিবে কী না করিবে এরূপ

একটা দ্বিধামিশ্রিত উল্লাসের ভাব তাহার কথাবার্তায় ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছিল। দুর্গা বলিল— বিনি, আর দুটো শুকনো কাঠ দ্যাখ্ তো — আগুনটা জ্বলচে না ভালো—

বিনি তখন কাঠ আনিতে ছুটিল এবং একটু পরে এক বোঝা শুকনো বেলের ডাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল— এতে হবে দুগ্‌গা দিদি — না আর আনব? ... দুর্গা যখন বলিল — বিনি এসেচে — ও-ও তো এখানে খাবে — আর দুটো চাল নিয়ে আয় অপু— বিনির মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল। আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল— কী কী তরকারি দুগ্‌গা দিদি?

ভাত নামাইয়া দুর্গা ছোবাতে তেলটুকু দিয়া বেগুন তাহাতে ফেলিয়া দিয়া ভাজে। খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে ডাকিয়া বলে— ঠিক একেবারে সত্যিকারের বেগুন ভাজার মতো রং হচ্চে দেখচিস অপু! ঠিক যেন মা-র রান্না বেগুনভাজা, না?

অপুর ব্যাপারটায় আশ্চর্য বোধ হয়। তাহারও এতক্ষণ যেন বিশ্বাস হইতেছিল না যে তাহাদের বনভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার বেগুনভাজা সম্ভবপর হইবে! তাহার পর তিনজনে মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে, শুধু ভাত আর বেগুনভাজা, আর কিছু না। অপু গ্রাস মুখে তুলিবার সময় দুর্গা

সেদিকে চাহিয়া ছিল, আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে— কেমন হয়েচে রে বেগুনভাজা?

অপু বলে, — বেশ হয়েচে দিদি, কিন্তু নুন হয়নি যেন—

লবণকে রন্ধনের উপকরণের তালিকা হইতে ইহারা অদ্য একেবারেই বাদ দিয়াছে, লবণের বালাই রাখে নাই। কিন্তু মহাখুশিতে তিনজনে কোযো মেটে-আলুর ফল ভাতে ও পানসে আধপোড়া বেগুনভাজা দিয়া চড়ুইভাতির ভাত খাইতে বসিল। দুর্গার এই প্রথম রান্না, সে বিস্ময় মিশানো আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতের শিল্প সৃষ্টি উপভোগ করিতেছিল। এই বন-ঝোপের মধ্যে, এই শুকনো আতাপাতার রাশের মধ্যে, খেজুরতলায় ঝরিয়া-পড়া খেজুর পাতার পাশে বসিয়া সত্যিকারের ভাত তরকারি খাওয়া।

খাইতে খাইতে দুর্গা অপুর দিকে চাহিয়া হি হি করিয়া খুশির হাসি হাসিল। খুশিতে ভাতের দলা তাহার গলার মধ্যে আটকাইয়া যাইতেছিল যেন! বিনি খাইতে খাইতে ভয়ে ভয়ে বলিল—একটু তেল আছে দুগ্‌গাদি? মেটে আলুর ফল ভাতে মেখে নিতাম!

দুর্গা বলিল—অপু, ছুটে নিয়ে আয় একটু তেল—

অপু বলল— মাকে কী বলবি দিদি? আবার ওবেলা ভাত খাবি?

—দূর, মাকে কখনও বলি। সন্দের পর দেখিস খিদে পাবে এখন—

যুগীর বামুন বলিয়া পাড়ায় জল খাইতে চাহিলে লোকে ঘটিতে করিয়া জল খাইতে দেয়; তাহাও আবার মাজিয়া দিতে হয়। বিনি দু-একবার ইতস্তত করিয়া অপুর গ্লাসটা দেখাইয়া বলিল—আমার গালে একটু জল ঢেলে দাও তো অপু? জল তেষ্টা পেয়েছে!

অপু বলিল— নাও না বিনিদি, তুমি নিয়ে চুমুক দিয়ে খাও না!

তবু যেন বিনির সাহস হয় না। খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে দুর্গা বলিল — হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার আর-একদিন বনভোজন করব— কেমন তো?

১৭

দিন কয়েক পরে। ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি রানুর দিদির বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কুটুম্ব-কুটুম্বিনীরা সকলে যান নাই। ছেলেমেয়েও অনেক। একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে দুর্গার বেশ আলাপ হইয়াছে, তাহার নাম টুনি। তাহার বাপও আসিয়াছিলেন। আজ দুপুরের পর স্ত্রী ও কন্যাকে কিছুদিনের জন্য এখানে রাখিয়া কর্ম্মস্থানে গিয়াছেন। ঘণ্টাখানেক পরে, সেজো ঠাকরুন ঘরে কী কাজ করিতেছিলেন, টুনির মায়ের গলা তাঁহার কানে গেল। সেজো ঠাকরুন দালানে আসিয়া বলিলেন—কী রে হাসি, কী?

টুনির মা উত্তেজিতভাবে ও ব্যস্তভাবে বিছানাপত্র, বালিশের তলা হাতড়াইতেছে, উঁকি মারিতেছে, তোশক উলটাইয়া ফেলিয়াছে; বলিল— এই একটু আগে আমার সেই সোনার সিঁদুরের কৌটোটা এই বিছানার পাশে এইখানটায় রেখেছি, খোকা দোলায় চেঁচিয়ে উঠল, উনি বাড়ি থেকে এলেন— আর তুলতে

মনে নেই—কোথায় গেল আর তো পাচ্চিনে?—

সেজো ঠাকরুন বলিলেন— ওমা সে কী? হাতে করে নিয়ে যাসনি তো?

না দিদিমা, এইখানে রেখে গেলুম। বেশ মনে আছে, ঠিক এইখানে—

সকলে মিলিয়া খানিকক্ষণ চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করা হইল, কৌটার সন্ধান নাই। সেজো ঠাকরুন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, দালানে প্রথমটা এ বাড়ির ছেলেমেয়ে ছিল, তারপর খাওয়ার ডাক পড়িলে ছেলেমেয়েরা সব খাবার খাইতে যায়, তখন বাহিরের লোকের মধ্যে ছিল দুর্গা। সেজো ঠাকরুনের ছোটো মেয়ে টেঁপি চুপি চুপি বলিল— আমরা যেই খাবার খেতে গেলাম দুগ্‌গাদি তখন দেখি যে খিড়কির দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই মাত্তর আবার এসেছে—

সেজো ঠাকরুন চুপি চুপি কী পরামর্শ করিলেন, পরে রুক্ষসুরে দুর্গাকে বলিলেন— কৌটো দিয়ে দে দুগ্‌গা, কোথায় রেখেচিস বল— বার কর এখ্‌খুনি বলচি—

দুর্গার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, সেজো ঠাকরুণের ভাবভঙ্গিতে তাহার জিব যেন মুখের মধ্যে জড়াইয়া গেল। অস্পষ্টভাবে কী বলিল ভালো বোঝা গেল না।

টুনির মা এতক্ষণ কোনো কথা বলে নাই— একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে সকলে মিলিয়া চোর বলিয়া ধরাতে সে একটু অবাক হইয়া গিয়াছিল, বিশেষত দুর্গাকে সে কয়েকদিন এখানে দেখিতেছে, দেখিতে বেশ চেহারা বলিয়া দুর্গাকে সে পছন্দ করে—সে চুরি করিবে ইহা কি সম্ভব? সে বলিল—ও নেয়নি বোধহয় সেজদি—ও কেন—

সেজো ঠাকরুন বলিলেন— তুমি চুপ করে থাকো না! তুমি ওর কী জানো, নিয়েচে কী না নিয়েচে আমি জানি ভালো করে—

একজন বলিলেন—তা নিয়ে থাকিস বের করে দে নয়তো কোথায় আছে বল— আপদ চুকে গেল। দিয়ে দে লক্ষ্মীটি, কেন মিথ্যে—

দুর্গা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল—তাহার পা ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল—সে দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল— আমি তো জানিনে কাকিমা— আমি তো—

সেজো ঠাকরুন বলিলেন— বল্লেই আমি শুনব? ঠিক ও নিয়েচে—ওর ভাব দেখে আমি বুঝতে পেরেচি। আচ্ছা, ভালো কথায় বলচি কোথায় রেখেচিস দিয়ে দে, জিনিস দিয়ে দাও তো কিছু বলব না— আমার জিনিস পেলেই হলো—

পরে তিনি দুর্গার হাতখানা ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া তাহাকে দালানের মাঝখানে আনিয়া বলিলেন, দুর্গা বল এখনও কোথায় রেখেছিস?...বলবিনে? না তুমি জানো না, তুমি খুকি—তুমি কিচ্ছু জানো না— শিগগির বল, নইলে দাঁতের পাটি একেবারে সব ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলব এখুনি! বল শিগগির— বল এখনও বলচি—

টুনির মা হাত ধরিতে আগাইয়া আসিতেছিল, একজন কুটুম্বিনী বলিলেন, রোসো না, দেখচো না ওই ঠিক নিয়েচে। চোরের মারই ওষুধ— দিয়ে দাও এখুনি মিটে গেল,—কেন মিথ্যে—

দুর্গার মাথার মধ্যে কেমন করিতেছিল। সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া অতি কষ্টে শুকনো জিবে জড়াইয়া উচ্চারণ করিল—আমি তো জানিনে কাকিমা, ওরা সব চলে গেল আমিও তো— কথা বলিবার

সময় সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া সেজো ঠাকরুনের দিকে চোখ রাখিয়া দেয়ালের দিকে ঘেঁষিয়া যাইতে লাগিল।

পরে সকলে মিলিয়া আরও খানিকক্ষণ তাহাকে বুঝাইল। তাহার সেই এক কথা—সে জানে না।

কে একজন বলিল — পাকা চোর—

টেঁপি বলিল — বাগানের আমগুলো তলায় পড়বার জো নেই কাকিমা—

শেষোক্ত কথাতেই বোধহয় সেজো ঠাকরুনের কোনো ব্যথায় ঘা লাগিল। তিনি হঠাৎ বাজখাঁই রকমের আওয়াজ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন — তবে রে পাজি, নচ্ছার, চোরের ঝাড়, তুমি জিনিস দেবে না? দেখি তুমি দেও কি না দেও! কথা শেষ না করিয়াই তিনি দুর্গার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার মাথাটা লইয়া সজোরে দেয়ালে ঠুকিতে লাগিলেন। বল কোথায় রেখেচিস — বল এখুনি — বল শিগগির — বল।

টুনির মা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া সেজো ঠাকরুনের হাত ধরিয়া বলিল, করেন কী — করেন কী সেজদি—থাকগে আমার কৌটো—ওরকম করে মারেন কেন?—ছেড়ে দিন—থাক, হয়েছে, ছাড়ুন, ছিঃ! টুনি মার দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল! পূর্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন... এঃ রক্ত পড়ছে যে...

দুর্গার নাক দিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে কেহ লক্ষ করে নাই। বুকের কাপড়ের খানিকটা রক্তরাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

টুনির মা বলিলেন, — শিগগির একটু জল নিয়ে আয় টেঁপি — রোয়াকের বালতিতে আছে দ্যাখ—

চেঁচামেচি ও হইচই শুনিয়া পাশের বাড়ির কামারদের ঝি-বউরা ব্যাপার কী দেখিতে আসিল। রানুর মা এতক্ষণ ছিলেন না—দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে কামারবাড়ি বসিয়া গল্প করিতেছিলেন — তিনিও আসিলেন।

মারের চোটে দুর্গার মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, সে দিশাহারা ভাবে ভিড়ের মধ্যে একবার চাহিয়া কী দেখিল।

জল আসিলে রানুর মা তাহার চোখে মুখে জল দিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। তাহার মাথার মধ্যে তেমন ঝিম ঝিম করিতেছিল, সে দিশাহারা ভাবে বসিয়া পড়িল। রানুর মা বলিলেন — অমন করে কী মারে সেজদি?...রোগা মেয়েটা — ছিঃ—

— তোমরা ওকে চেনোনি এখনও। চোরের মার ছাড়া ওষুধ নেই এই বলে দিলুম — মারের এখন হয়েছে কি — না পাওয়া গেলে ছাড়ব না কি? হরি রায় আমায় যেন শূলে ফাঁসে দেয় এরপর —

রানুর মা বলিলেন — হয়েচে, এখন একটু সামলাতে দাও সেজদি— যে কাণ্ড করেচ —

টুনির মা বলিল — ওমা এত হবে জানলে কে কৌটোর কথা বলত?...চাইনে আমার কৌটো—ওকে ছেড়ে দাও সেজদি —

সেজো ঠাকরুন এত সহজে ছাড়িতেন কি না বলা যায় না, কিন্তু জনমত তাঁহার বিরুদ্ধে রায় দিতে লাগিল। কাজেই তিনি আসামিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

রানুর মা তাহাকে ধরিয়া ওদিকের দরজা খুলিয়া খিড়কির উঠানে বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন — খুব ক্ষেণে আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলি যা হোক! যা আস্তে আস্তে যা — টেঁপি খিড়কিটা ভালো করে খুলে দে—

দুর্গা দিশাহারাভাবে খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া গেল।

১৮

গ্রামে বারোয়ারি চড়কপূজার সময় আসিল।

বাড়ি বাড়ি গাজনের সন্ন্যাসী নাচিতে বাহির হইয়াছে। দুর্গা ও অপু আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদলের পিছনে পিছনে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইল। অন্য অন্য গৃহস্থ বাড়ি হইতে পুরানো কাপড় দেয়, চাল পয়সা দেয়—কেউ বা ঘড়া দেয় — তাহারা কিছুই দিতে পারে না দুটো চাল ছাড়া—এজন্য তাহাদের বাড়িতে এ দল কোনো বারই আসে না। দশ-বারো দিন সন্ন্যাসী-নাচনের পর চড়কের পূর্বরাত্রে নীলপূজা আসিল।

নীলপূজার দিন বৈকালে একটা ছোটো খেজুরগাছে সন্ন্যাসীরা কাঁটা ভাঙে— এবার দুর্গা আসিয়া খবর দিল প্রতি বৎসরের সে গাছটাতে এবার কাঁটা-ভাঙা হইবে না, নদীর ধারে আর একটা গাছ সন্ন্যাসীরা এবার পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়াছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া দুর্গা ও অপু সেখানে গিয়া জোটে। তারপর কাঁটা-ভাঙার নাচ হইয়া গেলে সকলে চড়কতলাটাতে একবার বেড়াইতে যায়। খেজুরের ডাল দিয়া নীলপূজার মণ্ডপ ঘিরিয়াছে—চড়কতলার মাঠের শেওড়াবন ও অন্যান্য জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। সেখানে ভুবন মুখুজ্যেদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইল—রানি, পুঁটি, টুনু—এদের বাড়িতে কড়া শাসন আছে, দুর্গার মতো টো টো করিয়া যেখানে সেখানে বেড়াইবার হুকুম নাই—অতি কষ্টে বলিয়া কহিয়া ইহারা চড়কতলা পর্যন্ত আসিয়াছে।

টুনু বলিল—আজ রাত্রে সন্নিসিরা শ্মশান জাগাতে যাবে—

রানি বলিল— আহা, তা বুঝি আর জানিনে? একজন মড়া হবে। তাকে বেঁধে নিয়ে যাবে শ্মশানের সেই ছাতিমতলায়। তাকে আবার বাঁচাবে, তারপর মড়ার মুণ্ড নিয়ে আসবে—ছড়া বলতে বলতে আসবে—ওর সব মন্তর আছে—

দুর্গা বলিল— আমি জানি ওদের ছড়া, শুনবি বলব?

সগ্‌গো থেকে এল রথ
নামল খেতুতলে
চব্বিশ কুটি বাণবর্ষা শিবের সঙ্গে চলে—
সত্যযুগের মড়া আওল যুগের মাটি
শিব শিব বল রে ভাই ঢাকে দ্যাও কাঠি—

পরে হাসিয়া বলে—কেমন চমৎকার এবার গোষ্ঠবিহারের পুতুল হয়েচে নীলুদা?

...দাশু কুমোরের বাড়ি দেখে এলাম দেখিসনি রানু?

পুঁটি বলিল — সত্যিকারের মড়ার মুণ্ড রানুদি?

—নয় তো কী?...অনেক রাত্রে যদি আসিস তো দেখতে পাবি। চল ভাই আমরা বাড়ি যাই—আজ রাতটা ভালো নয়—আয়রে অপু, দুগ্‌গাদি আয়।

অপু বলিল—কেন ভালো নয় রানুদি? কী আজ হবে রাতে?...

রানু বলিল—সেসব কথা বলতে নেই—তুই আয় বাড়ি।

অপু গেল না, কিন্তু দুর্গা ওদের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল।—তারপর হঠাৎ মেঘ করিল, সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিল। অপু বাড়ি ফিরিতেছে, পথে জনপ্রাণী নাই, সন্ধ্যা হইতে শ্মশানের ও মড়ার মুণ্ডের গল্প শুনিয়া তাহার কেমন ভয় ভয় করিতেছে। মোড়ের বাঁশবনের কাছে আসিয়া মনে হইল কীসের যেন কটুগন্ধ বাহির হইতেছে। সে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। আর একটুখানি গিয়া নেড়ার ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা। নেড়ার ঠাকুমা নীলপূজার নৈবেদ্য হাতে চড়কতলায় পূজা দিতে যাইতেছে। অপু অন্ধকারে প্রথমটা চিনিতে পারে নাই, পরে চিনিয়া বলিল—কীসের গন্ধ বেরিয়েছে ঠাকুমা?

বুড়ি বলিল—আজ ওঁরা সব বেরিয়েচেন কিনা? তারই গন্ধ আর কী—

অপু বলিল—কারা ঠাকুরমা?

—কারা আবার—শিবের দলবল, সন্দেবেলা ওদের নাম করতে নেই—রাম রাম—রাম রাম—

অপুর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। চারিধারে অন্ধকার সন্ধ্যা, আকাশে কালো মেঘ, বাঁশবন, শ্মশানের গন্ধ, শিবের অনুচর ভূতপ্রেত—ছোটো ছেলের মন বিস্ময়ে, ভয়ে, রহস্যে, অজানার অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সে আতঙ্কের সুরে বলিল—আমি কী করে বাড়ি যাব ঠাক্‌মা!

বুড়ি বকিয়া উঠিল—তা এত রাত করাই বা কেন বাপু আজকের দিনে?...

এসো আমার সঙ্গে। নীলপুজোর থালাখানা দিয়ে আসি, তারপর এগিয়ে দেবো’খন — ধন্যি যা হোক—

বারোয়ারি তলায় ঘাস চাঁচিয়া প্রকাণ্ড বাঁশের মেরাপ, বাঁশের সামিয়ানা টাঙানো হইয়াছে। যাত্রার দল আসে আসে—এখনও পৌঁছে নাই, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, লোকে বলে কাল সকালের গাড়িতে আসিবে, সকাল চলিয়া গেলে, বৈকালের আশায় থাকে। অপুর স্নানাহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। রাতে অপুর ঘুম হয় না, বাঁধভাঙা বন্যার স্রোতের মতো কৌতূহল ও খুশির যে কী প্রবল অদম্য উচ্ছ্বাস! বিছানায় ছটফট, এপাশ-ওপাশ করে। যাত্রা হবে! যাত্রা হবে! যাত্রা হবে।

মায়ের বারণ আছে অত বড়ো মেয়ে পাড়া ছাড়িয়া কোথাও না যায়, দুর্গা চুপি চুপি গিয়া দেখিয়া আসিয়া আসর-সজ্জা ও বাঁশের গায়ে ঝুলানো লাল-নীল কাগজের অভিনবত্ব সম্বন্ধে গল্প করে। অপুর মনে হয়, যে পঞ্চাননতলায় সে দু-বেলা কড়িখেলা করে, সেই তুচ্ছ অত্যন্ত পরিচিত সামান্য স্থানটাতে আজ বা কাল নীলমণি হাজরার দলের যাত্রার মতো একটা অভূতপূর্ব অবাস্তব ঘটনা ঘটিবে, এও কি সম্ভব? কথাটা যেন তাহার বিশ্বাসই হয় না।

হঠাৎ শুনিতে পাওয়া যায় আজ বিকালেই দল আসিবে। একঝলক রক্ত যেন বুক হইতে নাচিয়া চলকাইয়া একেবারে মাথায় উঠিয়া পড়ে!...

কুমারপাড়ার মোড়ে দুপুরের পর হইতেই সকল ছেলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর দূরে একখানা গোরুর গাড়ি তাহার চোখে পড়িল, সাজের বাক্স বোঝাই গাড়ি — এক, দুই, তিন, চার, পাঁচখানা! পটু একে একে আঙুল দিয়া গুনিয়া খুশির সুরে বলিল — অপুদা, আমরা এদের পেছনে পেছনে এদের বাসায় গিয়ে দেখে আসি, যাবি? সাজের গাড়িগুলোর পেছনে দলের লোকেরা যাইতেছে, সকলের মাথায় টেরিকাটা, অনেকের জুতা হাতে! পটু একজন দাড়িওয়ালাকে দেখাইয়া কহিল — এ বোধহয় রাজা সাজে, না অপুদা?

আকাশ বাতাসের রং একেবারে বদলাইয়া গেল — অপু মহা উৎসাহে বাড়ি ফিরিয়া দেখে তাহার বাবা দাওয়ায় বসিয়া কী লিখিতেছে ও গুন গুন করিয়া গান করিতেছে। সে ভাবে যাত্রা আসিবার কথা তাহার বাবাও জানিতে পারিয়াছে, তাই এত স্ফূর্তি। উৎসাহে হাত নাড়িয়া বলে—সাজ একেবারে পাঁচ গাড়ি বাবা! এরকম দল!—

হরিহর শিষ্যবাড়ি বিলি করিবার জন্য বালির কাগজে কবচ লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলে—কীসের সাজ রে খোকা? অপু আশ্চর্য হইয়া যায়, এত বড়ো ঘটনা বাবার জানা নাই! বাবাকে সে নিতান্ত কৃপার পাত্র বিবেচনা করে।

সকালে উঠিয়া অপুকে পড়িতে বসিতে হয়। খানিক পরে সে কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে—আমি বারোয়ারিতলায় যাব বাবা, সকলে যাচ্চে আর আমি এখন বুঝি বসে বসে পড়ব! এখ্‌খুনি যদি যাত্রা আরম্ভ হয়?

তাহার বাবা বলে — পড়ো, পড়ো, এখন বসে পড়ো, যাত্রা আরম্ভ হলে ঢোল বাজবার শব্দ তো শুনতে পাওয়া যাবে? তখন না হয় যেয়ো এখন। প্রৌঢ় বয়সের ছেলে, নিজে সবসময়ে আজকাল বিদেশে থাকে, অল্পদিনের জন্য বাড়ি আসিয়া ছেলেকে চোখ-ছাড়া করিতে চায় না। অভিমানে রাগে অপুর চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। সে কান্না-ভরা গলায় আবার 'শুভঙ্করী' শুরু করে — মাস মাহিনা যার যত, দিন তার পড়ে কত?

কিন্তু সকালে যাত্রা বসে না, খবর আসে ওবেলা বসিবে। ওবেলা অপু মায়ের কাছে যাইয়া কাঁদো কাঁদো ভাবে বাবার অত্যাচারের কাহিনি আনুপূর্বিক বর্ণনা করে। সর্বজয়া আসিয়া বলে—দাও না গো ছেলেটাকে ছেড়ে? বছরকারের দিনটা — তোমার ন-মাস বাড়িতে থাকা নেই বছরে, আর ও একদিনের পড়াতে একেবারে তক্কালঙ্কার ঠাকুর হয়ে উঠবে কিনা?

অপু ছুটি পায়। সারা দুপুর তাহার বারোয়ারিতলায় কাটে। বৈকালে যাত্রা বসিবার পূর্বে বাড়িতে খাবার খাইতে আসিল। বাবা রোয়াকে বসিয়া কবচ লিখিতেছে। অন্যদিন এসময় তাহাকে তাহার বাবার কাছে বসিয়া বই পড়িতে হয়। পাছে ছেলে চটিয়া যায় এই ভয়ে তাহার বাবা তাহাকে খুশি রাখিবার জন্য নানারকম কৌতুকের আয়োজন করে। বলে, খোকা চট করে শিলেটে লিখে আনো দিকি, ঐঃ ভূত বাপরে !... অপু সব অদ্ভুত ধরনের কথা শুনিয়া হাসিয়া খুন হয়, তাড়াতাড়ি লিখিয়া আনিয়া দেখায়। বলে বাবা এইটে হয়ে গেলে আমি কিন্তু চলে যাব...তাহার বাবা বলে — যেয়ো এখন, যেয়ো এখন খোকা — আচ্ছা চট করে লিখে আনো দিকি — আর একটা অদ্ভুত কথা বলে। অপু আবার হাসিয়া উঠে।

আজ কিন্তু অপুর মনে হইল, বাহির হইতে কী একটা প্রচণ্ড শক্তি আসিয়া তাহাকে তাহার বাবার নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। বাবা নির্জন ছায়াভরা বৈকালে বাঁশবন ঘেরা বাড়িতে একা বসিয়া লিখিতেছে, কিন্তু এমন শক্তি নাই যে, তাহাকে বসাইয়া রাখে। এখন যদি বলে—খোকা, এসো পড়তে বসো—অমনি চারিদিক হইতে একটা যেন ভয়ানক প্রতিবাদের হট্টগোল উঠিবে। সকলে যেন বলিবে—না, না, এ হয় না ! যাত্রা যে বসে বসে ! ... কোন উল্লাসের প্রবল শক্তি তাহার বাবাকে যেন নিতান্ত অসহায়, নিরীহ, দুর্বল করিয়া দিয়াছে। সাধ্য নাই যে, তাহার পড়িবার কথা পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করে ! বাবার জন্য অপুর মন কেমন করে।

দুর্গা বলিল—অপু, তুই মাকে বল না আমিও দেখতে যাব। অপু বলে মা, দিদি কেন আসুক না আমার সঙ্গে ? চিক দিয়ে ঘিরে দিয়েচে সেইখেনে বসবে ?

মা বলে—এখন থাক; ওই ওদের বাড়ির মেয়েরা যাবে, আমি তাদের সঙ্গে যাব—আমার সঙ্গে যাবে এখন।

বারোয়ারিতলায় যাইবার সময় দুর্গা পিছন হইতে তাহাকে ডাকিল—শোন অপু! পরে সে কাছে আসিয়া হাসিহাসি মুখে বলিল—হাত পাত দিকি! অপু হাত পাতিতেই দুর্গা তাহার হাতে দুটো পয়সা রাখিয়াই তাহার হাতটা নিজের দু-হাতের মধ্যে লইয়া মুঠা পাকাইয়া দিয়া বলিল—দু-পয়সার মুড়কি কিনে খাস, নয়তো যদি লিচু বিক্রি হয় তো কিনে খাস।

ইহার দিনসাতেক পূর্বে একদিন অপু আসিয়া চুপি চুপি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল — তোর পুতুলের

বাক্সে পয়সা আছে? একটা দিবি? দুর্গা বলিয়াছিল — কী হবে পয়সা তোর? অপু দিদির মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল — নিচু খাব — কথা শেষ করিয়া সে পুনরায় লজ্জার হাসি হাসিল। কৈফিয়তের সুরে বলে—বোষ্টমদের বাগানে ওরা মাচা বেঁধেছে দিদি, অনেক নিচু পেড়েচে, দু-ঝুড়ি-ই-ই—এক পয়সায় ছটা, এই এত বড়ো বড়ো, একেবারে সিঁদুরের মতো রাঙা! সতু কিনলে, সাধন কিনলে—পরে একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল— আছে দিদি?

দুর্গার পুতুলের বাক্সে সেদিন কিছুই ছিল না, সে কিছু দিতে পারে নাই। অপুকে বিরসমুখে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সেদিন তাহার খুব কষ্ট হইয়াছিল, তাই কাল বৈকালে সে বাবার কাছে পয়সা দুটা চড়ক দেখিবার নাম করিয়া চাহিয়া লয়। সোনার ভাঁটার মতো ভাইটা, মুখের আবদার না রাখিতে পারিলে দুর্গার ভারি মন কেমন করে।

অপু চলিয়া গেলে তাহার মা ঘাট হইতে আসিয়া বলে—দুগ্‌গা একটা কাজ কর তো! রানুদের বাগান থেকে দুটো সাদা গন্ধভেদালি পাতা খুঁজে নিয়ে আয় তো—অপুর শরীরটা অসুখ করেচে, একটু ঝোল করে দোব।

মায়ের কথায় সে একছুটে রানুদের বাগানে যায়—বাগানে মানুষ-সমান উঁচু ঘন আগাছার জঙ্গলের মধ্যে গন্ধভেদালির পাতা খুঁজিতে খুঁজিতে মনের সুখে মাথা দুলাইয়া পিসিমার মুখে ছেলেবেলায় শেখা একটি ছড়া আবৃত্তি করে—

হলুদ বনে বনে—
নাক-ছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে—

১৯

যাত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই, কেহ নাই — শুধু অপু আছে, আর নীলমণি হাজরার যাত্রার দল আছে সামনে। সন্ধ্যার আগে বেহালায় ইমন আলাপ করে, ভালো বেহালাদার। পাড়াগাঁয়ের ছেলে কখনও সে ভালো জিনিস শোনে নাই — উদাস-করুণ সুরে হঠাৎ মন কেমন করিয়া উঠে — মনে হয় বাবা এখনও বসিয়া বাড়িতে সেই কী লিখিতেছে — দিদি আসিতে চাহিয়াও আসিতে পারে নাই। প্রথমে যখন জরির সাজপোশাক পরিয়া টাঙানো ঝাড় ও কড়ির ডুমের আলো-সজ্জিত আসরে রাজা মন্ত্রীর দল আসিতে আরম্ভ করে, অপু মনে মনে ভাবে এমন সব জিনিস তাহার বাবা দেখিল না! সবাই তো আসরে আসিয়াছে গ্রামের, তাহাদের পাড়ার কোনো লোক তো বাকি নাই! বাবা কেন এখনও...? পালা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। সেবার সে বালক-কীর্তনের দলের যাত্রা শুনিয়াছিল — সে কী, আর এ কী! কী সব সাজ! কী সব চেহারা!...

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলে — খোকা বেশ দেখতে পাচ্ছ তো?...তাহার বাবা কখন আসরে আসিয়া বসিয়াছে অপু জানিতে পারে নাই। বাবার দিকে ফিরিয়া বলে — বাবা দিদি এসেচে?...চিকের মধ্যে বুঝি?

মন্ত্রীর গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যখন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া বনে চলিতেছেন, তখন কাঁদুনে সুরে বেহালার সংগত হয়। তারপর রাজা করুণ রস বহুক্ষণ জমাইয়া রাখিবার জন্য স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া এক এক পা করিয়া থামেন, আর এক এক পা অগ্রসর হইতে থাকেন, সত্যিকার জগতে কোনো বনবাস গমনোদ্যত রাজা নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ না হইলে একদল লোকের সম্মুখে সেরূপ করে না। বিশ্বস্ত রাজ-সেনাপতি রাগে এমন কাঁপেন যে মৃগীরোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষেও তাহা হিংসার বিষয় হইবার কথা। অপু অপলক চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকে, মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া যায়; এমন তো সে কখনও দেখে নাই।

তারপর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন রাজা, কোথায় গিয়াছেন রানি। ...ঘন নিবিড় বনে শুধু রাজপুত্র অজয় ও রাজকুমারী ইন্দুলেখা ভাইবোন ঘুরিয়া বেড়ায়। কেউ নাই যে তাহাদের মুখের দিকে চায়, কেউ নাই যে নির্জন বনে তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলে। ছোটো ভাইয়ের জন্য ফল আনিতে একটু দূরে চলিয়া যাইয়া ইন্দুলেখা আর ফেরে না। অজয় বনের মধ্যে বোনকে খুঁজিয়া বেড়ায়—তাহার পর নদীর ধারে হঠাৎ খুঁজিয়া পায় ইন্দুলেখার মৃতদেহ—ক্ষুধার তাড়নায় বিষফল খাইয়া সে মরিয়া গিয়াছে। অজয়ের করুণ গান—কোথা ছেড়ে গেলি এ বন কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণ সাথি রে — শুনিয়া অপু এতক্ষণ মুগ্ধ চোখে চাহিয়াছিল—আর থাকিতে পারে না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।

কলিঙ্গরাজের সহিত বিচিত্রকেতুর যুদ্ধে তলোয়ার খেলা কী! ...যায়, বুঝি ঝাড়গুলো গুঁড়া হয়, নয় তো কোন হতভাগ্য দর্শকের চোখ দুটি বা যায়। রব ওঠে — ঝাড় সামলে — ঝাড় সামলে! কিন্তু অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল — সব বাঁচাইয়া চলে — ধন্য বিচিত্রকেতু!

মধ্যে অনেক্ষণ ধরিয়া জুড়ির দীর্ঘ গান ও বেহালার কসরত-এর সময় অপুকে তাহার বাবা ডাকিয়া বলে — ঘুম পাচ্ছে...বাড়ি যাবে খোকা?... ঘুম! সর্বনাশ! না সে বাড়ি যাইবে না। বাহিরে ডাকিয়া তাহার বাবা বলে — এই দুটো পয়সা রাখো বাবা, কিছু কিনে খেয়ো, আমি বাড়ি গেলাম। অপুর ইচ্ছা হয় সে এক পয়সার পান কিনিয়া খাইবে, পানের দোকানের কাছে অত্যন্ত কীসের ভিড় দেখিয়া অগ্রসর হইয়া দেখে, অবাক কান্ড! সেনাপতি বিচিত্রকেতু হাতিয়ারবন্দ অবস্থায় বার্ডসাই কিনিয়া ধরাইতেছেন—তাঁহাকে ঘিরিয়া রথযাত্রার ভিড়। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য! রাজকুমার অজয় কোথা হইতে আসিয়া বিচিত্রকেতুর কনুই-এ হাত দিয়া বলিল — এক পয়সার পান খাওয়াও না কিশোরীদা...রাজপুত্রের প্রতি সেনাপতির বিশ্বস্ততার নিদর্শন দেখা গেল না—হাত ঝাড়া দিয়া বলিল — যাঃ অত পয়সা নেই — ওবেলা সাবানখানা যে দুজনে মাখলে আমাকে কী বলেছিলে? রাজপুত্র পুনরায় বলিল — খাওয়াও না কিশোরীদা? আমি বুঝি কখনও কিছু দিইনি তোমাকে? বিচিত্রকেতু হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

অপুর সমবয়সি হইবে। টুকটুকে, বেশ দেখিতে, গানের গলা বড়ো সুন্দর। অপু মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে — বড়ো ইচ্ছা হয় আলাপ করিতে। হঠাৎ সে কীসের টানে সাহসী হইয়া আগাইয়া যায় — একটু লজ্জার সঙ্গে বলে — পান খাবে? ... অজয় একটু অবাক হয়, বলে — তুমি খাওয়াবে? নিয়ে এসো না। দুজনে ভাব হইয়া যায়। ভাব বলিলে ভুল হয়। অপু মুগ্ধ অভিভূত হইয়া যায়! ইহাকেই সে

এতদিন মনে মনে চাহিয়া আসিয়াছে—এই রাজপুত্র অজয়কে। তাহার মায়ের শত রূপকথার কাহিনির মধ্য দিয়া, শৈশবের শত স্বপ্নময়ী মুগ্ধ কল্পনার ঘোরে তাহার প্রাণ ইহাকেই চাহিয়াছে—এই চোখ, এই মুখ, এই গলার স্বর! ঠিক সে যাহা চায় তাহাই। অজয় জিজ্ঞাসা করে—তোমাদের বাড়ি কোথায় ভাই?... আমাকে একজনের বাড়ি খেতে দিয়েছে, বড্ড বেলায় খেতে দেয়। তোমাদের বাড়িতে খায় কে?...

খুশিতে অপুর সারা গা কেমন করে, সে বলে—ভাই, আমাদের বাড়িতে একজন খেতে যায়, সে আজ দেখলাম ঢোলক বাজাচ্চে—তুমি কাল থেকে যেয়ো, আমি এসে ডেকে নিয়ে যাব—ঢোলকওয়ালা না হয় তুমি যেবাড়িতে আগে খেতে, সেখানে খাবে—

খানিকক্ষণ দুজনে এদিক-ওদিক বেড়াইবার পর অজয় বলে—আমি যাই ভাই, শেষ সিনে আমার গান আছে—আমার পার্ট কেমন লাগচে তোমার?

শেষ রাত্রে যাত্রা ভাঙিলে অপু বাড়ি আসে। পথে আসিতে আসিতে যে যেখানে কথা বলে, তাহার মনে হয় যাত্রার অ্যাকটো হইতেছে। বাড়িতে তাহার দিদি বলে—ও অপু, কেমন যাত্রা শুনলি?...অপুর মনে হয়, গভীর জনশূন্য বনের মধ্যে রাজকুমারী ইন্দুলেখা কী বলিয়া উঠিল। কীসের যে ঘোর তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে! মহা খুশির সহিত সে বলে—কাল থেকে, অজয় যে সেজেছিল মা, সে আমাদের বাড়ি খেতে আসবে—

তাহার মা বলে—দুজনে খাবে?—দুজনকে কোত্থেকে—

অপু বলে,—তা না, একজন তো চলে যাবে, শুধু অজয় খাবে—

দুর্গা বলে—কেমন যাত্রা রে অপু?... এমন কক্ষনো দেখিনি—কেমন গান কল্লে যখন সেই রাজকন্যে মরে গেল! অপুর তো রাত্রে ঘুমের ঘোরে চারিধারে যেন বেহালা সংগীত হয়। ভোর হইলে একটু বেলায় তাহার ঘুম ভাঙে—শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছে, তৃপ্তির সঙ্গে ঘুম হয় নাই, সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোয় চোখে যেন সুঁচ বিঁধে। চোখে জল দিলে জ্বালা করে। কিন্তু তাহার কানে একটা বেহালা-ঢোল-মন্দিরার ঐকতান বাজনা তখনও যেন বাজিতেছে—তখনও যেন সে যাত্রার আসরে বসিয়া আছে।

ঘাটের পথে যাইতে পাড়ার মেয়েরা কথা বলিতে বলিতে যাইতেছে, অপুর মনে হইল কেহ ধীরাবতী, কেহ কলিঙ্গদেশের মহারানি, কেহ রাজপুত্র অজয়ের মা বসুমতী। দিদির প্রতি কথায়, হাত-পা নাড়ার ভঙ্গিতে, রাজকন্যা ইন্দুলেখা যেন মাখানো। কাল যে ইন্দুলেখা সাজিয়াছিল তাহাকে মানাইয়াছিল মন্দ নয় বটে, কিন্তু তাহার মনে মনে রাজকন্যা ইন্দুলেখার যে প্রতিমা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার দিদিকে লইয়া, ওইরকম গায়ের রং, অমনি বড়ো বড়ো চোখ, অমনি সুন্দর মুখ, অমনি সুন্দর চুল!

ইন্দুলেখা তাহার সকল করুণা, স্নেহ, মাধুরী লইয়া কোন সেকালের দেশের অতীত জীবনের পরে আবার তাহার দিদি হইয়া যেন ফিরিয়া আসিয়াছে—কাল তাই ইন্দুলেখার কথার ভঙ্গিতে, প্রতি পদক্ষেপে দিদিই যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। যখন গভীর বনে সে শতস্নেহে ছোটোভাইকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে খাওয়াইবার জন্য ফল আহরণ করিতে গিয়া এক নির্জন বনের মধ্যেই হারাইয়া গেল— সেই একদিনের মাকাল ফলের ঘটনাটাই অপুর ক্রমাগত মনে হইতেছিল।

দুপুরবেলা খাইবার জন্য অপু গিয়া অজয়কে ডাকিয়া আনিল। তাহার মা দুজনকে এক জায়গায় খাইতে

দিয়া অজয়ের পরিচয় লইতে বসিল। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, তাহার কেহ নাই, এক মাসি তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, সেও মরিয়া গিয়াছে। আজ বছরখানেক যাত্রার দলে কাজ করিতেছে। সর্বজয়ার ছেলেটির উপর খুব স্নেহ হইল—বারবার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। খাওয়াইবার উপকরণ বেশি কিছু নাই তবু ছেলেটি খুব খুশির সঙ্গে খাইল। তাহার পর দুর্গা মাকে চুপি চুপি বলিল—মা ওকে সেই কালকের গানটা গাইতে বলো না — সেই 'কোথা ছেড়ে গেলি এ বন-কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথি রে'—

অজয় গলা ছাড়িয়া গানটি গাহিল — অপু মুগ্ধ হইয়া গেল — সর্বজয়ার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। আহা এমন ছেলের মা নাই! তাহার পর সে আরও গান গাহিল। সর্বজয়া বলিল — বিকেলে মুড়ি ভাজব, তখন এসে অবিশ্যি করে মুড়ি খেয়ে যেয়ো — লজ্জা কোরো না যেন — যখন খুশি আসবে, আপনার বাড়ির মতো, বুঝলে?

অপু তাহাকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধারের দিকে বেড়াইতে গেল। সেখানে অজয় বলিল, ভাই তোমার তো গলা মিষ্টি — একটা গান গাও না? ... অপুর খুব ইচ্ছা হইল ইহার কাছে গান গাহিয়া সে বাহাদুরি লইবে। কিন্তু বড়ো ভয় করে — এ একজন যাত্রাদলের ছেলে — এর কাছে তার গান গাওয়া? নদীর ধারে বড়ো শিমুলগাছটার তলায় চলা-চল্‌তির পথ হইতে কিছুদূরে বাঁশ ঝোপের আড়ালে দুজনে বসে। অপু অনেক কষ্টে লজ্জা কাটাইয়া একটা গান করে — শ্রীচরণে ভার একবার গা তোলো হে অনন্ত — দাশু রায়ের পাঁচালির গান বাবার মুখে শুনিয়া সে লিখিয়া লইয়াছে। অজয় অবাক হইয়া যায়, বলে — তোমার এমন গলা ভাই? তা তুমি গান গাও না কেন? ... আর একটা গাও। অপু উৎসাহিত হইয়া আর একটা ধরে — খেয়ার পাশে বসে রে মন ডুবল বেলা খেয়ার ধারে। তাহার দিদি কোথা হইতে শিখিয়া আসিয়া গাহিত, সুরটা বড়ো ভালো লাগায় অপু তাহার কাছ হইতে শিখিয়াছিল — বাড়িতে কেহ না থাকিলে মাঝে মাঝে গানটা তাহারা দুজনে গাহিয়া থাকে।

গান শেষ হইলে অজয় প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বলিল — এমন গলা থাকলে যে-কোনো দলে ঢুকলে পনেরো টাকা করে মাইনে সেধে দেবে বলচি তোমায় — এর ওপর একটু যদি শেখো!

বাড়িতে কেহ না থাকিলে দিদির সামনে গাহিয়া অপু কতদিন দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—হ্যাঁ দিদি, আমার গলা আছে? গান হবে?...দিদি তাহাকে বরাবর আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দিদির আশ্বাস যতই আশাপ্রদ হউক, আজ একজন সংগীতদক্ষ খাস যাত্রার দলের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে এ প্রশংসার কথা শুনিয়া আনন্দে অপু কী বলিয়া উত্তর করিবে ঠাওর করিতে পারিল না।

বলিল — তোমার ওই গানটা আমায় শেখাও না? — তাহার পর দুইজনে গলা মিশাইয়া সে গানটা গাহিল।

অনেকক্ষণ হইয়া গেল। নদী বাহিয়া ছপ ছপ করিয়া নৌকা চলিতেছে, নদীর পাড়ের নীচে জলের ধারে একজন কী খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, অজয় বলিল, কী খুঁজচে ভাই? অপু বলিল — ও ব্যাঙাচি খুঁজচে, ছিপে মাছ ধরবে — তাহার পর বলিল — আচ্ছা ভাই, তুমি আমাদের এখানে থাকো না কেন?...যেয়ো না কোথাও, থাকবে?...

এমন চোখ, এমন মিষ্টি গলার সুর! তাহার উপর অপুর কাছে সে রাজপুত্র অজয়। কোন বনে ফিরিতে ফিরিতে অসহায় ছন্নছাড়া রূপবান রাজার ছেলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া ভাব হইয়া গিয়াছে — চিরজন্মের বন্ধু! আর তাহাকে কী করিয়া ছাড়া যায়!

অজয়ও অনেক মনের কথা বলিয়া ফেলিল। এমন সাথি তাহার আর জুটে নাই। সে প্রায় চল্লিশ টাকা জমাইয়াছে। আর একটু বড়ো হইলে সে এ-দল ছাড়িয়া দিবে। অধিকারী বড়ো মারে। সে আশুতোষ পালের দলে যাইবে — সেখানে বড়ো সুখ, রোজ রাত্রে লুচি। না খাইলে তিন আনা পয়সা খোরাকি দেয়। এ দল ছাড়িলে সে আবার অপুদের বাড়ি আসিবে ও সেসময় কিছুদিন থাকিবে। বৈকালের কিছু আগে অজয় বলিল — চলো ভাই, আজ আবার এখুনি আসর হবে, সকাল সকাল ফিরি। যদি 'পরশুরামের দর্প-সংহার' হয় তবে আমি নিয়তি সাজব, দেখো কেমন একটা গান আছে —

আরও তিন দিন যাত্রা হইল। গ্রামসুদ্ধ লোকের মুখে যাত্রা ছাড়া আর কথা নাই। পথে ঘাটে মাঠে গাঁয়ের মাঝি নৌকা বাহিতে বাহিতে, রাখাল গোরু চরাইতে চরাইতে যাত্রার পালার নতুন শেখা গান গায়। গ্রামের মেয়েরা দলের ছেলেদের বাড়ি ডাকাইয়া যাহার যে গান ভালো লাগিয়াছে তাহার মুখে সে গান

ফরমাইশ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। অপু আরও তিন চারটা গান শিখিয়া ফেলিল। এক দিন সে যাত্রার দলের বাসায় অজয়ের সঙ্গে গিয়াছে, সেখানে তাহাকে দলের সকলে মিলিয়া ধরিল, তাহাকে একটা গান গাহিতে হইবে। সেখানে সকলে অজয়ের মুখে শুনিয়াছে সে খুব ভালো গান গাহিতে পারে। অপু বহু সাধ্য সাধনার পর নিজের বিদ্যা ভালো করিয়া জাহির করিবার খাতিরে একটা গাহিয়া ফেলিল। সকলে তাহাকে ধরিয়া অধিকারীর নিকটে লইয়া গেল। সেখানেও তাহাকে একটা গাহিতে হইল। অধিকারী কালো রং-এর ভুঁড়িওয়ালা লোক, আসরে জুড়ি সাজিয়া গান করে। গান শুনিয়া বলিল — এসো না খোকা, দলে আসবে? অপুর বুকখানা আনন্দে ও গর্বে দশহাত হইল! আরও সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরে — এসো, চলো তোমাকে আমাদের দলে নিয়ে যাই। অপুর তো ইচ্ছা সে এখনি যায়। যাত্রার দলে কাজ করা মনুষ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্য, সেকথা এতদিন সে কেন জানিত না, ইহাই তো আশ্চর্যের বিষয়। সে গোপনে অজয়কে বলিল — আচ্ছা ভাই, এখন যদি আমি দলে যাই, আমাকে কি সাজতে দেবে?

অজয় বলিল — এখন এই সখী-ঠখী, কী বালকের পার্ট এইরকম, তারপর ভালো করে শিখলে—

অপু সখী সাজিতে চায় না—জরির মুকুট মাথায় সে সেনাপতি সাজিয়া তলোয়ার ঝুলাইবে, যুদ্ধ করিবে। বড়ো হইলে সে যাত্রার দলে যাইবেই, উহাই তাহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য।

দিনপাঁচেক পরে যাত্রা দলের গাওনা শেষ হইয়া গেলে তাহারা রওনা হইল। অজয় বাড়ির ছেলের মতো যখন তখন আসিত যাইত, এই কয় দিনে সে যেন অপুরই আর এক ভাই হইয়া পড়িয়াছিল! অপুরই বয়সি ছোটো ছেলে, সংসারে কেহ নাই শুনিয়া সর্বজয়া তাহাকে এ কয়দিনে অপুর মতো যত্ন করিয়াছে। দুর্গাও তাহাকে আপন ভাইয়ের চোখে দেখিয়াছে — তাহার কাছে গান শিখিয়া লইয়াছে, কত গল্প শুনাইয়াছে, তিনজনে মিলিয়া উঠানে বড়ো ঘর আঁকিয়া গঙ্গা-যমুনা খেলিয়াছে, খাইবার সময় জোর করিয়া বেশি খাইতে বাধ্য করিয়াছে। যাত্রাদলে থাকে, কে কোথায় দ্যাখে, কোথায় শোয়, কী খায়, 'আহা' বলিবার কেহ নাই গৃহ সংসারের যে স্নেহস্পর্শ বোধহয় জন্মাবধিই তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার স্বাদ লাভ করিয়া লোভীর মতো সে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছিল না।

যাইবার সময় সে হঠাৎ পুঁটুলি খুলিয়া কষ্টে সঞ্চিত পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া সর্বজয়ার হাতে দিতে গেল। একটু লজ্জার সুরে বলিল—এই পাঁচটা টাকা দিয়ে দিদির বিয়ের সময় একখানা ভালো কাপড়—

সর্বজয়া বলিল—না বাবা, না—তুমি মুখে বললে এই খুব হলো, টাকা দিতে হবে না, তোমার এখন টাকার কত দরকার—বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হতে হবে—

তবু সে কিছুতেই ছাড়ে না। অনেক বুঝাইয়া তবে তাহাকে নিরস্ত করিতে হইল।

তাহার পর সকলে বাড়ির দরজার সামনে খানিকটা পথ পর্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিল। যাইবার সময় সে বারবার বলিয়া গেল দিদির বিয়ের সময় অবশ্য করিয়া যেন তাহাকে পত্র দেওয়া হয়।

গাবতলার ছায়ায় ছায়ায় তাহার সুকুমার বালকমূর্তি ভাঁটশেওড়া ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল, বড্ড ছেলেমানুষ, আহা, এই বয়সে বেরিয়েছে নিজের রোজগার নিজে করতে। অপুর আমার যদি ওইরকম হতো—মাগো!...

২০

প্রথম প্রথম যখন হরিহর কাশী হইতে আসিল তখন সকলে বলিত তাহার ভবিষ্যৎ বড়ো উজ্জ্বল, এ অঞ্চলে ওরকম বিদ্যা শিখিয়া কেহ আসে নাই। তাহার বিদ্যার সুখ্যাতি সকলের মুখে ছিল, সকলে বলিত সে এইবার একটা কিছু করিবে।

সর্বজয়াও ভাবিত, শীঘ্রই উহারা তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া একটা ভালো চাকুরি দিবে। কিন্তু মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর করিয়া বহুকাল চলিয়া গেল, অন্ধরাত্রির মাথায় কোনো জরির পোশাকপরা ঘোড়সওয়ার সভাপণ্ডিত পদের নিয়োগপত্র লইয়া ছুটিয়া আসিল না, বা আরব্য উপন্যাসের দৈত্য কোনো মণিখচিত মায়াপ্রাসাদ আকাশ বাহিয়া উড়াইয়া আনিয়া তাহাদের ভাঙা ঘরে বসাইয়া দিয়া গেল না, বরং সে ঘরের পোকা-কাটা কবাট দিন দিন আরও জীর্ণ হইতে চলিল, কড়িকাঠ আরও ঝুলিয়া পড়িতে চাহিল; আগে যাও বা ছিল তাও আর সব থাকিতেছে না, তবু সে একেবারে আশা ছাড়ে নাই। হরিহরও বিদেশ হইতে আসিয়া প্রতিবারেই একটা আশার কথা এমনভাবে বলে, যেন সব ঠিক, অল্পমাত্র বিলম্ব আছে, অবস্থা ফিরিল বলিয়া। কিন্তু হয় কই?...

জীবন বড়ো মধুময় শুধু এই জন্য যে, মাধুর্যের অনেকটাই স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়া গড়া। হোক না স্বপ্ন মিথ্যা, কল্পনা বাস্তবতার লেশশূন্য; নাই বা থাকিল সবসময় তাহাদের পিছনে সার্থকতা, তাহারাই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহারা আসুক, জীবনে অক্ষয় হোক তাহাদের আসন; তুচ্ছ স্বার্থকতা, তুচ্ছ লাভ।

এবার হরিহর যখন বিদেশে যায়, তখন বলিয়া গিয়াছে এইবার সে এখান হইতে উঠিয়া অন্যত্র বাস করিবার একটা কিছু ঠিক করিয়া আসিবেই।

পাড়ার একপাশে নিকনো-পুছানো ছোট্ট খড়ের ঘর দু-তিনখানা। গোয়ালে হৃষ্টপুষ্ট দুগ্ধবতী গাভী বাঁধা, মাচা ভরা বিচালি, গোলা ভরা ধান। মাঠের ধারের মটর ক্ষেতের তাজা, সবুজ গন্ধ খোলা হাওয়ায় উঠান দিয়া বহিয়া যায়। পাখি ডাকে— নীলকণ্ঠ, বাবুই, শ্যামা। অপু সকালে উঠিয়া বড়ো মাটির ভাঁড়ে দোয়া একপাত্র তাজা সফেন কালো গাই-এর দুধের সঙ্গে গরম মুড়ির ফলার খাইয়া পড়িতে বসে। দুর্গা ম্যালেরিয়ায় ভোগে না। গরিব বলিয়া কেহ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না।

..... শুধুই স্বপ্ন দেখে, দিন নাই রাত নাই, সর্বজয়া শুধুই স্বপ্ন দেখে। তাহার মনে হয়, এতকাল পরে সত্য-সত্যই একটা কিছু লাগিয়া যাইবে। মনের মধ্যে কে যেন বলে।

দুর্গা একটা ছোট্ট মানকচু কোথা হইতে জোগাড় করিয়া আনিয়া রান্নাঘরে ধরনা দিয়া বসিয়া থাকে। তাহার মা বলে, তোর হলো কী দুগ্‌গা? আজ কী বলে ভাত খাবি? কাল সন্ধেবেলাও তো জ্বর এসেছে? দুর্গা বলে, তা হোক সে জ্বর বুঝি — একটু তো মোটে শীত করল?.... তুমি এই মানকচুটা ভাতে দিয়ে দুটো ভাত —।

তাহার মা বলে — যাঃ, অসুখ হয়ে তোর খাই খাই বড্ড বেড়েছে। আজ কাল ভালো যদি থাকিস তো পরশু বরং দেবো!

অনেক কাকুতিমিনতির পর না পারিয়া শেষে দুর্গা মানকচু তুলিয়া রাখিয়া দেয়। খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আপন মনে বলে, আজ খুব ভালো আছি, আজ আর জ্বর আসবে না আমার—ওবেলা দু-খানা রুটি আর আলুভাজা খাব। একটু পরে হাই উঠে, সে জানে জ্বর আসার পূর্ব লক্ষণ! তবুও সে মনকে বোঝায়, হাই উঠুক, এমনি তো কত হাই ওঠে, জ্বর আর হবে না। ক্রমে শীত করে, রৌদ্রে গিয়া বসিতে ইচ্ছা হয়। সে রৌদ্রে না গিয়া মনকে প্রবোধ দেয় যে, শীত বোধ হওয়া একটা স্বাভাবিক শারীরিক ব্যাপার, জ্বর আসার সহিত ইহার সম্পর্ক কী?

কিন্তু কোনো প্রবোধ খাটে না। রৌদ্র না পড়িতে পড়িতে জ্বর আসে, সে লুকাইয়া গিয়া রৌদ্রে বসে, পাছে মা টের পায়। তাহার মন হু হু করে, ভাবে — জ্বর জ্বর ভেবে এরকম হচ্চে, সত্যি সত্যি জ্বর হয়নি—

রাঙা রোদ শেওলাধরা ভাঙা পাঁচিলের গায়ে গিয়া পড়ে। বৈকালের ছায়া ঘন হয়। দুর্গার মনে হয় অন্যমনস্ক হইয়া থাকিলে জ্বর চলিয়া যাইবে। অপুকে বলে, বোস দিকি একটু আমার কাছে, আয় গল্প করি।

একদিন আর-বছর ঘন বর্ষার রাতে সে ও অপু মতলব আঁটিয়া শেষরাত্রে পিছনে সেজো ঠাকরুনদের বাগানে তাল কুড়াইতে গিয়াছিল, হঠাৎ দুর্গার পায়ে পট করিয়া এক কাঁটা ফুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় পিছু হাঁটিয়া বাঁ পা-খানা যেখানে রাখিল, সে বাঁ পায়েও পট করিয়া আর একটা? ....সকালবেলা দেখা গেল, পাছে রাত্রে উহারা কেহ তাল কুড়াইয়া লয়, এজন্য সতু তালতলার পথে সোজা করিয়া সারি সারি বেলকাটা পুঁতিয়া রাখিয়াছে।

আর একদিন যা আশ্চর্য ব্যাপার!

কোথা হইতে সেদিন এক বুড়া বাঙাল মুসলমান একটা বড়ো রং-চং করা কাচ বসানো টিনের বাক্স লইয়া খেলা দেখাইতে আসে। ওপাড়ার জীবন চৌধুরির উঠানে সে খেলা দেখাইতেছিল দুর্গা পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পয়সা ছিল না। আর সকলে এক এক পয়সা দিয়া বাক্সের গায়ে একটা চোঙের মধ্যে চোখ দিয়া কী সব দেখিতেছিল।

বুড়া মুসলমানটি বাক্স বাজাইয়া সুর করিয়া বলিতেছিল, তাজ বিবিকা রোজা দেখো, হাতি বাঘকা লড়াই দেখো! এক একজনের দেখা শেষ হইলে যেমন সে চোং হইতে চোখ সরাইয়া লইতেছিল অমনি দুর্গা তাহাকে মহা আগ্রহের সহিত জিগ্যেস করিতেছিল, কী দেখলি রে ওর মধ্যে? সব সত্যিকারের?

উঃ সে কী অপূর্ব ব্যাপার দেখিয়াছে তাহা তাহারা বলিতে পারে না। কী সে সব!

সকলের দেখা একে একে হইয়া গেল। দুর্গা চলিয়া যাইতেছিল, বুড়া মুসলমানটি বলিল, দেখবে না খুকি?...দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নাঃ — আমার কাছে পয়সা নেই।

লোকটি বলিল, এসো এসো খুকি, দেখে যাও — পয়সা লাগবে না —

দুর্গার একটু লজ্জা হইয়াছিল, মুখে বলিল, নাঃ — কিন্তু আগ্রহে কৌতূহলে তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল।

লোকটি বলিল—এসো এসো, দোষ কী?...এসো দেখো—

দুর্গা উজ্জ্বল মুখে পায়ে পায়ে বাক্সের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল বটে, তবুও সাহস করিয়া মুখটা চোঙের মধ্যে দিতে পারে নাই। লোকটি বলিল, এই নলটার মধ্যে দিয়ে তাকাও দিকি খুকি?

দুর্গা মাথায় উড়ন্ত চুলের গোছা পাশে সরাইয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল। পরের দশ মিনিটের কথার সে কোনো বর্ণনা করিতে পারে না। সত্যিকারের মানুষ ছবিতে কী করিয়া দেখা যায়? কত সাহেব, মেম, ঘর-বাড়ি, যুদ্ধ সেসব কথা সে বলিতে পারে না। কী জিনিসই সে দেখিয়াছিল!

অপুকে দেখাইতে বড়ো ইচ্ছা করে, দুর্গা কতবার খুঁজিয়াছে, ও খেলা আর কোনো দিন আসে নাই।

গল্প ভালো করিয়া শেষ হইতে না হইতে দুর্গা জ্বরের ধমকে আর বসিতে পারে না, উঠিয়া ঘরের মধ্যে কাঁথা মুড়ি দিয়া শোয়।

আজকাল বাবা বাড়ি নাই, অপুকে আর খুঁজিয়া মেলা দায়। বই দপ্তরে ঘুণ ধরিবার জোগাড় হইয়াছে। সকালবেলা সেই যে এক পুঁটুলি কড়ি লইয়া বাহির হয়, আর ফেরে একেবারে দুপুর ঘুরিয়া গেলে খাইবার সময়। তাহার মা বকে — ছেলের না নিকুচি করেছে — তোমার লেখাপড়া একেবারে ছিকেয় উঠল? এবার বাড়ি এলে সব কথা বলে দেবো, দেখো এখন তুমি —

অপু ভয়ে ভয়ে দপ্তর লইয়া বসে। বইগুলো খুব চারিদিকে ছড়ায়! মাকে বলে, একটু খয়ের দাও মা, আমি দোয়াতের কালিতে দেবো —

পরে সে বসিয়া হাতের লেখা লিখিয়া রৌদ্রে দেয়। শুকাইয়া গেলে খয়ের ভিজানো কালি চক চক করে — অপু মহাখুশির সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে! ভাবে — আর একটু খয়ের দেবো কাল থেকে — ওঃ, কী চক্‌চক্ করচে দেখো একবার! পানের বাটা হইতে মাকে লুকাইয়া বড়ো একখণ্ড খয়ের লইয়া কালির দোয়াতে দেয়। পরে লেখা লিখিয়া শুখাইতে দিয়া কতটা আজ জ্বলজ্বল করে দেখিবার জন্য কৌতূহলের সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে। মনে হয় — আচ্ছা, যদি আর একটু দি?

একদিন মার কাছে ধরা পড়িয়া যায়। মা বলে, ছেলের লেখার সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল ড্যালা ড্যালা খয়ের রোজ দরকার — রেখে দে খয়ের —

ধরা পড়িয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া বলে, খয়ের নইলে কালি হয় বুঝি?...আমি বুঝি এমনি এমনি —

অপু বসিয়া বসিয়া একখানা খাতায় নাটক লেখে। বহু লিখিয়া খাতাখানা সে প্রায় ভরাইয়া ফেলিয়াছে, মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় রাজা রাজ্য ছাড়িয়া বনে যান, রাজপুত্র নীলাম্বর ও রাজকুমারী অম্বা বনের মধ্যে দস্যুর হাতে পড়েন, ঘোর যুদ্ধ হয়, পরে রাজকুমারীর মৃতদেহ নদীতীরে দেখা যায়। নাটকে সতু বলিয়া একটি জটিল চরিত্র সৃষ্ট হইবার অল্প পরেই বিশেষ কোনো মারাত্মক দোষের বর্ণনা না থাকা সত্ত্বেও সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। নাটকের শেষদিকে রাজপুত্রী অম্বার নারদের বরে পুনর্জীবন-প্রাপ্তি বা বিশ্বস্ত সেনাপতি জীবনকেতুর সহিত তাঁহার বিবাহ প্রভৃতি ঘটনা গত বৈশাখ মাসে দেখা যাত্রার পালা হইতে মূলত কোনো অংশেই পৃথক নহে।

দপ্তরে একখানা বই আছে, — বইখানার নাম চরিতমালা, লেখা আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। পুরানো বই, তাহার বাবার নানা জায়গা হইতে ছেলের জন্য বই সংগ্রহ করিবার বাতিক আছে, কোথা হইতে একখানা আনিয়াছিল, অপু মাঝে মাঝে খানিকটা পড়িয়া থাকে। বইখানাতে যাঁহাদের গল্প আছে সে ওই রকম হইতে চায়। হাটে আলু বেচিতে পাঠাইলে কৃষকপুত্র রস্কো বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া বীজগণিতের চর্চা করিত, কাগজের অভাবে চামড়ার পাতে ভোঁতা আল দিয়া অঙ্ক কষিত, মেষপালক ডুবাল ইতস্তত সঞ্চরণশীল মেষদলকে যদৃচ্ছ বিচরণের সুযোগ দিয়া একমনে গাছতলায় বসিয়া ভূচিত্র পাঠে মগ্ন থাকিত—সে ওইরকম হইতে চায়। 'বীজগণিত' কী জিনিস? সে বীজগণিত পড়িতে চায় রস্কোর মতো। সে এই হাতের লেখা লিখিতে চায় না, ধারাপাত কী শুভঙ্করী এসব তাহার ভালো লাগে না। ওইরকম নির্জন গাছতলায়, বনের ছায়ায়, কী বেড়ার ধারে বসিয়া সে 'ভূচিত্র' (জিনিসটা কী?) পাতিয়া পড়িবে,

বড়ো বড়ো বই পড়িবে, পণ্ডিত হইবে ওইরকম। কিন্তু কোথায় পাইবে সেসব জিনিস? কোথায় বা ‘ভূচিত্র’, কোথায় বা ‘বীজগণিত’ কোথায় বা ল্যাটিন ব্যাকরণ? — এখানে শুধুই কড়ি কষার আর্যা, আর তৃতীয় নামতা।

মা বকিলে কী হইবে, যাহা সে পড়িতে চায়, তাহা এখানে কই?

২১

কয়দিন খুব বর্ষা চলিতেছে। বৃষ্টির বিরাম নাই। একটু থামে, আবার অমনি জোরে আসে, বৃষ্টির ছাটে চারিধার ধোঁয়া ধোঁয়া।

হরিহর মোট পাঁচটা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহার পর আর পত্রও নাই, টাকাও নাই। সে অনেক দিন হইয়া গেল — রোজ সকালে উঠিয়া সর্বজয়া ভাবে আজ ঠিক খবর আসিবে। ছেলেকে বলে, তুই খেলে খেলে বেড়াস বলে দেখতে পাসনে, ডাক-বাক্সটার কাছে বসে থাকবি — পিওন যেমন আসবে আর অমনি জিজ্ঞেস করবি —

অপু বলে — বা, আমি বুঝি বসে থাকিনে? কালও তো এল পুঁটিদের চিঠি, আমাদের খবরের কাগজ দিয়ে গেল — জিজ্ঞেস করে এসো দিদি পুঁটিকে? কাল তবে আমাদের খবরের কাগজ কী করে এল? আমি থাকিনে বই-কি?

বর্ষা রীতিমতো নামিয়াছে। অপু মায়ের কথায় ঠায় রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে পিওনের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে! সাধু কর্মকারের ঘরের চালা হইতে গোলা পায়রার দল ভিজিতে ভিজিতে ঝটাপট করিয়া উড়িতে উড়িতে রায়েদের পশ্চিমের ঘরের কার্নিশে আসিতেছে, চাহিয়া চাহিয়া দ্যাখে। আকাশের ডাককে সে বড়ো ভয় করে। বিদ্যুৎ চমকাইলে মনে মনে ভাবে — দেবতা কীরকম নলপাচ্চে দেখেচো, এইবার ঠিক ডাকবে — পরে সে চোখ বুজিয়া কানে আঙুল দিয়া থাকে।

বাড়ি ফিরিয়া দ্যাখে মা ও দিদি সারা বিকালে ভিজিতে ভিজিতে রাশীকৃত কচুর শাক তুলিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় জড়ো করিয়াছে।

অপু বলে — কোত্থেকে আনলে? উঃ কত!

দুর্গা হাসিয়া বলে — কত —! উঃ উঃ! তোমার তো বসে বসে বড়ো সুবিধে! ওই ওদের ডোবার জামতলা থেকে — এই এতটা এক হাঁটু জল? যাও দিকি?

সকালে ঘাটে গিয়া নাপিত বউয়ের সঙ্গে দেখা হয়। সর্বজয়া কাপড়ের ভিতর হইতে কাঁসার একখানা রেকাবি বাহির করিয়া বলে, এই দ্যাখো জিনিসখানা, খুব ভালো — ভরণ না, কিছু না, ফুল কাঁসা। তুমি বলেছিলে, তাই বলি যাই নিয়ে — এ যে সে জিনিস নয়, এ আমার বিয়ের দান — এখন এ জিনিস আর মেলে না —

অনেক দরদস্তুরের পর নাপিত-বউ একটি আধুলি আঁচল হইতে খুলিয়া রেকাবিখানা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লয়। কাউকে যেন না প্রকাশ করে — সর্বজয়া এ অনুরোধ বারবার করে।

দুই একদিনে ঘনীভূত বর্ষা নামিল। হু-হু পুবে হাওয়া, খানাডোবা সব থই-থই করিতেছে — পথে ঘাটে একহাঁটু জল, দিন রাত সোঁ সোঁ, বাঁশবনে ঝড় বাধে — বাঁশের মাথা মাটিতে লুটাইয়া লুটাইয়া পড়ে — আকাশের কোথাও ফাঁক নাই — মাঝে মাঝে আগেকার চেয়েও অন্ধকার করিয়া আসে— কালো কালো মেঘের রাশ হু হু উড়িয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়াছে।

মহাঝড়!

দিন রাত সোঁ-সোঁ শব্দ — নদীর জল বাড়ে — কত ঘরদোর কত জায়গায় যে পড়িয়া গেল। .... নদী নালা জলে ভাসিয়া গিয়াছে — গোরু-বাছুর গাছের তলে, বাঁশবনে, বাড়ির ছাঁচতলায় অঝোরে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, পাখি পাখালির শব্দ নাই কোনোদিকে! আর অবিশ্রান্ত ধারা বর্ষণ! — অপু দাওয়ায় উঠিয়া তাড়াতাড়ি ভিজা মাথা মুছিতে মুছিতে বলিল — আমাদের বাঁশতলায় জল এসেচে দিদি, দেখবি?

দুর্গা কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিল, না উঠিয়াই বলিল — কতখানি জল এসেচে রে?

অপু বলে, তোর জ্বর সারলে কাল দেখে আসিস। তেতুঁলতলার পথে হাঁটু জল! পরে জিজ্ঞাসা করে — মা কোথায় রে?

ঘরে একটা দানা নাই — দুটোখানি বাসি চালভাজা মাত্র আছে। অপু কান্নাকাটি করে, — তা হবে না মা, আমার খিদে পায় না বুঝি— আমি দুটি ভাত খাব — হুঁউ—

তার মা বলিল, লক্ষ্মী মানিক আমার — ওরকম কী করে। অনেক করে চাল ভাজা মেখে দেব এখন — রাঁধব কেমন করে, দেখচিস নে কীরকম সেঁওটা করেচে? উনুনের মধ্যে এক উনুন জল যে? পরে সে কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কী বাহির করিয়া হাসিমুখে দেখাইয়া বলে — এই দ্যাখ একটা কইমাছ, বাঁশতলায় কানে হেঁটে দেখি বেড়াচ্চে — বন্যার জল পেয়ে সব উঠে আসছে গাং থেকে — বরোজ পোতার ডোবা ভেসে নদীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েচে কী না? তাই সব উঠে আসচে —

দুর্গা বলে — একটু জ্বর সারলে কাল সকালে চল অপু, তুই আর আমি বাঁশবাগান থেকে মাছ নিয়ে আসব এখন! পরে সে অবাক হইয়া ভাবে — বাঁশবাগানে মাছ। কী করে এল? বাঃ তো! — মা কী আর ভালো করে খুঁজেচে। খুঁজলে আরও সেখানে আছে — দেখতে পেলাম না কীরকম কই মাছ কানে হাঁটে — কাল সকালে দেখব — সকালে জ্বর সেরে যাবে —

চারিদিকে বন-বাগান ঘিরিয়া সন্ধ্যা নামে। সন্ধ্যার মেঘে ত্রয়োদশীর অন্ধকারে চারিধার একাকার! দুর্গা যে বিছানা পাতিয়া শুইয়া আছে, তাহারই এক পাশে তাহার মা ও অপু বসে।

ওদিকে ভাইবোনে তুমুল তর্ক বাধিয়া যায়! অপু সরিয়া মায়ের কাছে ঘেঁসিয়া বসে — ঠান্ডা হাওয়ায় বেজায় শীত করে। হাসিয়া বলে — মা — কী? সেই — শ্যামলঙ্কা বাটনা বাটে মাটিতে লুটায়ে কেশ?

দুর্গা বলে— ততক্ষণে মা আমায় ছেড়ে গিয়েচেন দেশ—

অপু বলে — দূর — হাঁ মা তাই? ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ? কথা বলিয়াই সে দিদির অজ্ঞতায় হাসে।

সর্বজয়ার বুকে ছেলের অবোধ উল্লাসের হাসি শেলের মতো বেঁধে। মনে মনে ভাবে — সাতটা নয় পাঁচটা নয় — এই তো একটা ছেলে — কী অদেষ্ট যে করে এসেছিলাম — তার মুখের আবদার রাখতে পারিনে — ঘি না, লুচি না, সন্দেশ না — কি না। শুধু দুটো ভাত — নিনক্যি! আবার ভাবে — এই ভাঙা ঘর, টানাটানির সংসার — অপু মানুষ হলে আর দুঃখ থাকবে না — ভগবান তাকে মানুষ করে তোলেন যেন।

তাহার পর সে বসিয়া বসিয়া গল্প করে, যখন প্রথম সে নিশ্চিন্দপুরে ঘর করিতে আসিয়াছিল, তখন এক বৎসর এইরকম অবিশ্রান্ত বর্ষায় নদীর জল এত বাড়িয়াছিল যে ঘাটের পথে মুখুজ্যেবাগানের কাছে খড় বোঝাই নৌকা পর্যন্ত আসিয়াছিল।

অপু বলে— কত বড়ো নৌকা মা?

মস্ত ওই যে চুনের নৌকা, সাজিমাটির নৌকা মাঝে মাঝে আসে দেখিচিস তো — অত বড়ো—

দুর্গা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—মা তুমি চারগুছির বিনুনি করতে জানো?

অনেক রাত্রে সর্বজয়ার ঘুম ভাঙিয়া যায় — অপু ডাকিতেছে — মা, ওমা ওঠো — আমার গায়ে জল পড়চে —

সর্বজয়া উঠিয়া আলো জ্বালে— বাহিরে ভয়ানক বৃষ্টির শব্দ হইতেছে — ফুটা ছাদ দিয়া ঘরের সর্বত্র জল পড়িতেছে। সে বিছানা সরাইয়া পাতিয়া দেয়। দুর্গা অঘোর জ্বরে শুইয়া আছে — তাহার মা গায়ে হাত দিয়া দ্যাখে তাহার গায়ের কাঁথা ভিজিয়া সপ সপ করিতেছে। ডাকিয়া বলে — দুর্গা— ও দুর্গা শুনছিস? একটু ওঠ দিকি? বিছানাটা সরিয়ে নি — ও দুর্গা — শিগগির, একেবারে ভিজে গেল যে সব —

ছেলেমেয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেও সর্বজয়ার ঘুম আসে না। অন্ধকার রাত— এই ঘন বর্ষা .... তাহার মন ছমছম করে — ভয় হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে ... কিছু ঘটিবে। ভাবে — সে মানুষেরই বা কি হলো? কোনো পত্তরও আসে না — টাকা মরুকগে যাক। এরকম তো কোনোবার হয় না? তাঁর শরীরটা ভালো আছে তো? মা সিদ্ধেশ্বরী, স-পাঁচ আনার ভোগ দেবো, ভালো খবর এনে দাও মা।

তার পরদিন সকালের দিকে সামান্য একটু বৃষ্টি থামিল। সর্বজয়া বাটীর বাহির হইয়া দেখিল বাঁশবনের মধ্যের ছোটো ডোবাটা জলে ভরতি হইয়া গিয়াছে। ঘাটের পথে নিবারণের মা ভিজিতে ভিজিতে কোথায় যাইতেছিল, সর্বজয়া ডাকিয়া বলিল — ও নিবারণের মা, শোন — পরে সলজ্জভাবে বলিল — সেই তুই একবার বলিছিলি না, বিন্দাবুনি চাদরের কথা তোর ছেলের জন্যে — তা নিবি?

নিবারণের মা বলিল — আছে? দেয়া একটু ধরুক, মোর ছেলেরে সঙেগ করে এখনি আসব এখন — নতুন আছে মা-ঠাকরোন, না পুরোনো?

সর্বজয়া বলিল, তুই আয় না — এখুনি দেখবি? একটু পুরোনো কিন্তু সে কেউ গায়ে দেয়নি- ধোয়া তোলা আছে — পরে একটু থামিয়া বলিল — তোরা আজকাল চাল ভানছিস নে?

নিবারণের মা বলিল — এই বাদলায় কি ধান শুকোয় মা-ঠাকরন?... খাবার বলে দুটোখানি রেখে দিইচি অমনি —

সর্বজয়া বলিল — এক কাজ কর না—তাই গিয়ে আমায় আধকাঠাখানেক আজ দিয়ে যাবি? একটু সরিয়া আসিয়া মিনতির সুরে বলিল — বৃষ্টির জন্যে বাজার থেকে চাল আনবার লোক পাচ্ছি নে — টাকা নিয়ে বেড়াচ্ছি, তা কেউ যদি রাজি হয়— বড়ো মুশকিলে পড়িচি মা।

নিবারণের মা স্বীকার হইয়া গেল,— বলিল — আসব এখন নিয়ে কিন্তু সে ভেটেল ধানের চালির ভাত কি আপনারা খেতে পারবেন মা ঠাকরন?... বড্ড মোটা—

নিমছাল সিদ্ধ দুর্গা আর খাইতে পারে না। তাহার অসুখ একভাবেই আছে। ঔষধ নাই, পথ্য নাই, ডাক্তার নাই, বৈদ্য নাই। বলে — এক পয়সার বিস্কুট আনিয়ে দেবে মা, নোনতা, মুখে বেশ লাগে?

সাবু তাই জোটে না, তায় বিস্কুট!

২২

বৈকালবেলা হইতে আবার ভয়ানক বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও যেন বেশি করিয়া আসে।

বৃষ্টির শব্দে কান পাতা যায় না। দরজা জানালা দিয়া ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটার সঙ্গে বৃষ্টির ছাঁট হু হু করিয়া ঢোকে — ছেঁড়া থলে ছেঁড়া কাপড়-গোঁজা ভাঙা কবাটের আড়ালের সাধ্য কী যে ঝড়ের ভীম আক্রমণের মুখে দাঁড়ায়।

বেশি রাত্রে সকলে ঘুমাইলে বেশি বৃষ্টি নামিল। সর্বজয়ার ঘুম আসে না — সে বিছানায় উঠিয়া বসে। বাহিরে শুধু একটানা হুস হুস জলের শব্দ।

জীর্ণ কোঠাখানা এক একবারের দমকায় যেন থর থর করিয়া কাঁপে... ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া যায়... গ্রামের একধারে বাঁশবনের মধ্যে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে লইয়া নিঃসহায়!

সে যেন আর বসিয়া থাকিতে পারে না — কয়দিন সে ওলশাক কচুশাক সিদ্ধ করিয়া খাইয়া দিন কাটাইতেছে — নিজে উপবাসের পর উপবাস দিয়া ছেলেমেয়েকে যাহা কিছু সামান্য খাদ্য ছিল খাওয়াইতেছে — শরীর ভাবনায় অনাহারে দুর্বল, মাথার মধ্যে কেমন করে।

একবার বড়ো একটা দমকায় ভয় পাইয়া সে ঝড়ের গতিক বুঝিবার জন্য সন্তর্পণে দালানের দুয়ার খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে মুখ বাড়াইল... বৃষ্টির ছাঁটে কাপড় চুল সব ভিজিয়া গেল।

আতঙ্কে সর্বজয়া দোর বন্ধ করিয়া দিল — আচ্ছা, যদি এখন একটা কিছু ঘরে ঢোকে? মানুষ কী অন্য কোনো জানোয়ার? চারিদিকে ঘন বাঁশবন, জঙ্গল, লোকজনের বসতি নাই — মাগো। জলের

ছাঁটে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে... হাত দিয়া দেখিল ঘুমন্ত অপুর গা জলে ভিজিয়া ন্যাতা হইয়া যাইতেছে— সে কী করে? আর কত রাত আছে? — সে বিছানা হাতড়াইয়া দেশলাই খুঁজিয়া কেরোসিনের ডিবাটা জ্বালে। ডাকে — ও অপু, ওঠ তো? শুনছিস, ও অপু? ওঠ দিকি! দুর্গাকে বলে — পাশ ফিরে শো তো দুগ্‌গা। বড্ড জল পড়ছে — একটু সরে পাশ ফের দিকি—

অপু উঠিয়া বসিয়া ঘুমচোখে চারিদিকে চায় — পরে আবার শুইয়া পড়ে। হুড়ুম করিয়া বিষম কী শব্দ হয়, — সর্বজয়া তাড়াতাড়ি আবার দুয়ার খুলিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল — বাঁশবাগানের দিকটা ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতেছে — রান্নাঘরের দেয়াল পড়িয়া গিয়াছে?... তাহার বুক কাঁপিয়া ওঠে— এইবার বুঝি পুরানো কোঠাটা —? কে আছে, কাহাকে সে এখন ডাকে? মনে মনে বলে— হে ঠাকুর, আজকের রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে দাও, হে ঠাকুর ওদের মুখের দিকে তাকাও —

তখনও ভালো করিয়া ভোর হয় নাই, ঝড় থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু বৃষ্টি তখনও অল্প অল্প পড়িতেছে। পাড়ার নীলমণি মুখুজ্যের স্ত্রী গোহালের গোরুর অবস্থা দেখিতে আসিতেছেন, এমন সময় খিড়কিদোরে বার বার ধাক্কা শুনিয়া দোর খুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন — নতুন বউ! সর্বজয়া ব্যস্তভাবে বলিল— ন-দি, একবার বট্‌ঠাকুরকে ডাকো দিকি? একবার শিগগির আমাদের বাড়িতে আসতে বলো— দুগ্‌গা কেমন করচে!

নীলমণি মুখুজ্যের স্ত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন — দুগ্‌গা? কেন কী হয়েচে দুগ্‌গার?

সর্বজয়া বলিল — কদিন থেকে তো জ্বর হচ্ছিল — হচ্চে আবার যাচ্চে— ম্যালেরিয়ার জ্বর, কাল সন্দে থেকে জ্বর বড্ড বেশি — তার ওপর কাল রাত্রে কীরকম কাণ্ড তো জানোই— একবার শিগগির বট্‌ঠাকুরকে —

তাহার বিশ্রস্ত কেশ ও রাত-জাগা রাঙা রাঙা চোখের কেমন দিশাহারা চাহনি দেখিয়া নীলমণি মুখুজ্যের স্ত্রী বলিলেন — ভয় কী বউ — দাঁড়াও আমি এখুনি ডেকে দিচ্চি — চলো আমি যাচ্চি — কাল আবার রাত্তিরে গোয়ালের চালাখানা পড়ে গেল বাবা, কাল রাত্তিরের মতো কাণ্ড আমি তো কখনো দেখিনি — শেষরাত্রে সব উঠে গোরুটরু সরিয়ে রেখে আবার শুয়েচে কী না?... দাঁড়াও আমি ডাকি —

একটু পরে নীলমণি মুখুজ্যে, তাঁহার বড়ো ছেলে ফণী, স্ত্রী ও দুই মেয়ে সকলে অপুদের বাড়িতে আসিলেন।

দুর্গার বিছানার পাশে অপু বসিয়া আছে, নীলমণি মুখুজ্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন — কী হয়েচে বাবা অপু? — অপুর মুখে উদ্‌বেগের চিহ্ন। বলিল, দিদি কী সব বকছিল জ্যেঠামশায়।

নীলমণি বিছানার পাশে বসিয়া বলিলেন — দেখি হাতখানা?... জ্বরটা একটু বেশি, আচ্ছা কোনো ভয় নেই — ফণী, তুমি একবার চট করে নবাবগঞ্জে চলে যাও দিকি শরৎ ডাক্তারের কাছে — একেবারে ডেকে নিয়ে আসবে। পরে তিনি ডাকিলেন — দুর্গা, ও দুর্গা? দুর্গার অঘোর আচ্ছন্ন ভাব, সাড়াশব্দ নাই। নীলমণি বলিলেন, এঃ, ঘরদোরের অবস্থা তো বড্ড খারাপ? জল পড়ে কাল রাত্রে ভেসে গিয়েচে... তা বউমার লজ্জার কারণই বা কী — আমাদের ওখানে না হয় উঠলেই হতো?

একটু বেলায় নবাবগঞ্জ হইতে শরৎ ডাক্তার আসিলেন — দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। বলিয়া গেলেন যে, বিশেষ ভয়ের কোনো কারণ নাই। জ্বর বেশি হইয়াছে, মাথায় নিয়মিতভাবে জলপটি দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। হরিহর কোথায় আছে জানা নাই— তবুও তাহার পূর্ব ঠিকানায় তাহাকে একখানি পত্র দেওয়া হইল।

পরদিন ঝড় থামিয়া গেল—আকাশের মেঘ কাটিতে সুরু করিল। নীলমণি মুখুজ্যে দু-বেলা নিয়মিত দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। ঝড়-বৃষ্টি থামিবার পরদিন হইতেই দুর্গার জ্বর আবার বড়ো বাড়িল। শরৎ ডাক্তার সুবিধা বুঝিলেন না। হরিহরকে আর একখানা পত্র দেওয়া হইল।

অপু তাহার দিদির মাথার কাছে বসিয়া জলপটি দিতেছিল। দিদিকে দু-একবার ডাকিল — ও দিদি শুনছিস, কেমন আছিস, ও দিদি? দুর্গার কেমন আচ্ছন্ন ভাব। ঠোঁট নড়িতেছে, কী যেন আপন মনে বলিতেছে, ঘোর ঘোর। অপু মুখের কাছে কান লইয়া গিয়া দু-একবার চেষ্টা করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না।

বৈকালের দিকে জ্বর ছাড়িয়া গেল। দুর্গা আবার চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল এতক্ষণ পরে। ভারি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, চিঁ চিঁ করিয়া কথা বলিতেছে, ভালো করিয়া না শুনিলে বোঝা যায় না কী বলিতেছে।

মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে অপু দিদির কাছে বসিয়া রহিল। দুর্গা চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল — বেলা কত রে?

অপু বলিল — বেলা এখনও অনেক আছে — রোদ্দুর উঠেচে আজ দেখিচিস দিদি? এখনও আমাদের নারকেল গাছের মাথায় রোদ্দুর রয়েচে—

খানিকক্ষণ দুজনেই কোনো কথা বলিল না। অনেক দিন পরে রৌদ্র ওঠাতে অপুর ভারি আহ্লাদ হইয়াছে। সে জানালার বাহিরে রৌদ্রালোকিত গাছটার মাথায় চাহিয়া রহিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বলিল—শোন অপু— একটা কথা শোন—

— কীরে দিদি? পরে সে দিদির মুখের আরও কাছে মুখ লইয়া গেল!

— আমায় একদিন তুই রেলগাড়ি দেখাবি?

— দেখাব এখন— তুই সেরে উঠলে বাবাকে বলে আমরা সব একদিন গঙ্গা নাইতে যাব রেলগাড়ি করে—

সারা দিন রাত্রি কাটিয়া গেল। ঝড় বৃষ্টি কোনোকালে হইয়াছিল মনে হয় না। চারিধারে দারুণ শরতের রৌদ্র।

সকাল দশটার সময় নীলমণি মুখুজ্যে অনেকদিন পরে নদীতে স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া তেল মাখিতে বসিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর উত্তেজিত সুর তাঁর কানে গেল—ওগো, এসো তো একবার এদিকে শিগগির— অপুদের বাড়ির দিক থেকে যেন একটা কান্নার গলা পাওয়া যাচ্ছে—

ব্যাপার কী দেখিতে সকলে ছুটিয়া গেলেন!

সর্বজয়া মেয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিতেছে— ও দুগ্‌গা চা দিকি— ও মা ভালো করে চা দিকি—ও দুগ্‌গা—

নীলমণি মুখুজ্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন— কী হয়েচে— সরো, সব সরো দিকি — আহা কী সব বাতাসটা বন্ধ করে দাঁড়াও?

সর্বজয়া ভাসুর সম্পর্কের প্রবীণ প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে উপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল — ওগো, কী হলো, মেয়ে অমন করচে কেন?

দুর্গা আর চাহিল না!

আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে— পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে— পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূর পারে কোনো পথহীন পথে—দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড়ো অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে!

তখন আবার শরৎ ডাক্তারকে ডাকা হইল— বলিলেন — ম্যালেরিয়ার শেষ স্টেজটা আর কী— খুব জ্বরের পর যেমন বিরাম হয়েচে আর অমনি হার্টফেল করে — ঠিক এরকম একটা case হয়ে গেল সেদিন দশঘরায়—

আধ ঘণ্টার মধ্যে পাড়ার লোকে উঠান ভাঙিয়া পড়িল।

২৩

হরিহর বাড়ির চিঠি পায় নাই।

এবার বাড়ি হইতে বাহির হইয়া হরিহর রায় প্রথমে গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর যায়। কাহারও সঙ্গে তথায় পরিচয় ছিল না। শহর-বাজার জায়গা, একটা না একটা কিছু উপায় হইবে এই কুহকে পড়িয়াই সে সেখানে গিয়াছিল। গোয়াড়িতে কিছু দিন থাকিবার পর সে সন্ধান পাইল যে, শহরে উকিল কি জমিদারের বাড়িতে দৈনিক বা মাসিক চুক্তি হিসাবে চণ্ডীপাঠ করার কার্য প্রায়ই জুটিয়া যায়। আশায় আশায় দিন পনেরো কাটাইয়া বাড়ি হইতে পথখরচ বলিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু আনিয়াছিল ফুরাইয়া ফেলিল, অথচ কোথাও কিছু সুবিধা হইল না।

সে পড়িল মহাবিপদে—অপরিচিত স্থান, কেহ একটি পয়সা দিয়া সাহায্য করে এমন নাই— খোড়ে বাজারের যে হোটেলটিতে ছিল, পয়সা ফুরাইয়া গেলে সেখান হইতে বাহির হইতে হইল। একজনের নিকট শুনিল স্থানীয় হরিসভায় নবাগত অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণ পথিককে বিনামূল্যে থাকিতে ও খাইতে দেওয়া হয়। অভাব জানাইয়া হরিসভার একটা কুঠুরির একপাশে থাকিবার স্থান পাইল বটে, কিন্তু সেখানে বড়ো অসুবিধা, অনেকগুলি নিষ্কর্মা লোক রাত্রিতে সেখানে আড্ডা মারে, প্রায় সমস্ত রাত্রি হই হই করিয়া কাটায়।

অতি কষ্টে দিন কাটাইয়া সে শহরের বড়ো বড়ো উকিল ও ধনী গৃহস্থের বাড়িতে ঘুরিতে লাগিল। সারাদিন ঘুরিয়া অনেক রাত্রিতে ফিরিয়া এক-একদিন দেখিত তাহার স্থানটিতে তাহারই বিছানাটা টানিয়া লইয়া কে একজন অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। হরিহর কয়েকদিন বাহিরের বারান্দায় শুইয়া কাটাইল। একদিন প্রাতে সেক্রেটারিবাবু নিজ বাড়িতে হরিহরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও বলিলেন, তাঁহাদের হরিসভায় তিনদিনের বেশি থাকিবার নিয়ম নাই, সে যেন অন্যত্র বাসস্থান দেখিয়া লয়।

সন্ধ্যার পরে জিনিসপত্র লইয়া হরিহরকে হরিসভার বাড়ি হইতে বাহির হইতে হইল।

খোড়ে নদীর ধারে অল্প একটু নির্জন স্থানে পুঁটুলিটা নামাইয়া রাখিয়া নদীর জলে হাত-মুখ ধুইল।

সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নাই— সেদিন একটি কাঠের গোলাতে বসিয়া শ্যামাবিষয় গান করিয়াছিল — গোলার অধিকারী একটি টাকা প্রণামী দেয় — সেই টাকাটি হইতে কিছু পয়সা ভাঙাইয়া বাজার হইতে মুড়ি ও দই কিনিয়া আনিল। খাবার গলা দিয়া যেন নামে না — মাত্র দিন দশেকের সম্বল রাখিয়া সে বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছে। অদ্য প্রায় দুইমাসের উপর হইয়া গেল —এপর্যন্ত একটি পয়সা পাঠাইতে পারে নাই — এতদিন কী করিয়া তাহাদের চলিতেছে! অপু বাড়ি হইতে আসিবার সময় বারবার বলিয়া দিয়াছে — তাহার জন্য একখানা পদ্মপুরাণ কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্য। ছেলে বই পড়িতে বড়ো ভালোবাসে —মাঝে মাঝে সে বাপের বাক্স-দপ্তর হইতে লুকাইয়া বই বাহির করিয়া লইয়া পড়ে, তাহা হরিহর বুঝিতে পারে, বাক্সের ভিতর আনাড়ি হাতের হেলাগোছা করা থাকে — কোন বই বাবা বাক্সের কোথায় রাখে, ছেলে তাহা জানে না — উলটাপালটা করিয়া সাজাইয়া চুরি ঢাকিবার অক্ষম চেষ্টা করে— হরিহর বাড়ি ফিরিয়া বাক্স খুলিলেই বুঝিতে পারে ছেলের কীর্তি।

তাহার বাড়ি হইতে আসিবার পূর্বে হরিহর যুগীপাড়া হইতে একখানা বটতলার পদ্মপুরাণ পড়িবার জন্য লইয়া আসে— অপু বইখানা দখল করিয়া বসিল — রোজ রোজ পড়ে — কুচুনিপাড়ায় শিবঠাকুরের মাছ ধরিতে যাওয়ার কথাটা পড়িতে তাহার ভারি আমোদ — হরিহর বলে — বইখানা দ্যাও বাবা, যাদের বই তারা চাচ্ছে যে। অবশেষে একখানা পদ্মপুরাণ তাহাকে কিনিয়া দিতে হইবে — এই শর্তে বাবাকে রাজি করাইয়া তবে সে বই ফেরত দেয়। আসিবার সময় বারবার বলিয়াছে — সে বই একখানা এনো কিন্তু বাবা , এবার অবিশ্যি অবিশ্যি। দুর্গার উঁচু নজর নাই, সে বলিয়া দিয়াছে, একখানা সবুজ হাওয়াই কাপড় ও একপাতা ভালো দেখিয়া আলতা লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু সেসব তো দূরের কথা, কী করিয়া বাড়িতে সংসার চলিতেছে সেই না এখন সমস্যা? সন্ধ্যার পর পূর্বপরিচিত কাঠের গোলাটায় গিয়া সে রাত্রের মতো আশ্রয় লইল। ভালো ঘুম হইল না —বিছানায় শুইয়া বাড়িতে কী করিয়া কিছু পাঠায় এই ভাবনায় এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল।

রক্ষিত মহাশয়ের কাঠের গোলাতেই একদিন

একটা সন্ধান জুটিল। কৃষ্ণনগরের কাছে একটা গ্রামে একজন বর্ধিষ্ণু মহাজন গৃহ-দেবতার পূজা-পাঠ করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ খুঁজিতেছে, যে বরাবর টিকিয়া থাকিবে। রক্ষিত মহাশয়ের যোগাযোগে অবিলম্বে হরিহর সেখানে গেল—বাড়ির কর্তাও তাহাকে পছন্দ করিলেন। থাকিবার ঘর দিলেন, আদর আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি হইল না।

কয়েকদিন কাজ করিবার পরেই পূজা আসিয়া পড়িল। বাড়ি যাইবার সময় বাড়ির কর্তা দশ টাকা প্রণামি ও যাতায়াতের গাড়িভাড়া দিলেন, গোয়াড়িতে রক্ষিত মশায়ের নিকট বিদায় লইতে আসিলে সেখান হইতেও পাঁচটি টাকা প্রণামি পাওয়া গেল।

আকাশে-বাতাসে গরম রৌদ্রের গন্ধ, নীল নির্মেঘ আকাশের দিকে চাহিলে মনে হঠাৎ উল্লাস আসে, বর্ষাশেষের সরস সবুজ লতাপাতায়, পথিকের চরণভঙ্গিতে কেমন একটা আনন্দ মাখানো। রেলপথের দুপাশে কাশ ফুলের ঝাড় গাড়ির বেগে লুটাইয়া পড়িতেছে, চলিতে চলিতে কেবলই বাড়ির কথা মনে হয়।

রাণাঘাটের বাজারে সে স্ত্রী ও পুত্রকন্যার জন্য কাপড় কিনিল। দুর্গা লালপাড় কাপড় পরিতে ভালোবাসে, তাহার জন্য বাছিয়া একখানা ভালো কাপড়, ভালো দেখিয়া আলতা কয়েক পাতা। অপুর 'পদ্মপুরাণ' অনেক সন্ধান করিয়াও মিলিল না, অবশেষে একখানা 'সচিত্র চণ্ডী মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ছয় আনা মূল্যে কিনিয়া লইল। গৃহস্থালির টুকটাক দু-একটা জিনিস — সর্বজয়া বলিয়া দিয়াছিল একটা কাঠের চাকি-বেলুনের কথা, তাহাও কিনিল।

দেশের স্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বৈকালের দিকে সে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। পথে বড়ো একটা কাহারও সহিত দেখা হইল না, দেখা হইলেও সে হন হন করিয়া উদবিগ্নচিত্তে কাহারও দিকে লক্ষ না করিয়া বাড়ির দিকে চলিল। দরজায় ঢুকিতে ঢুকিতে আপন মনে বলিল — উঃ দেখো কাণ্ডখানা, বাঁশ ঝাড়টা ঝুঁকে পড়েচে একেবারে পাঁচিলের ওপর, ভুবনকাকা কাটাবেনও না — মুশকিল হয়েচে আচ্ছা --- পরে সে বাড়ির উঠানে ঢুকিয়া অভ্যাসমতো আগ্রহের সুরে ডাকিল— ও মা দুগ্‌গা — ও অপু—

তাহার গলার স্বর শুনিয়া সর্বজয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

হরিহর হাসিয়া বলিল, — বাড়ির সব ভালো? এরা সব কোথায় গেল? বাড়ি নেই বুঝি?

সর্বজয়া শান্তভাবে আসিয়া স্বামীর হাত হইতে ভারী পুঁটুলিটা নামাইয়া লইয়া বলিল, এসো — ঘরে এসো। স্ত্রী-র অদৃষ্টপূর্ব শান্তভাব হরিহর লক্ষ করিলেও তাহার মনে কোনো খটকা হইল না —তাহার কল্পনার স্রোত তখন উদ্দাম বেগে অন্যদিকে ছুটিয়াছে — এখনই ছেলেমেয়ে ছুটিয়া আসিবে — দুর্গা আসিয়া হাসিমুখে বলিবে —কী বাবা এর মধ্যে? অমনি তাড়াতাড়ি হরিহর পুঁটুলি খুলিয়া মেয়ের কাপড় ও আলতার পাতা এবং ছেলের 'সচিত্র চণ্ডীমাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ও টিনের রেলগাড়িটা দেখাইয়া তাহাদের তাক লাগাইয়া দিবে! সে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, বেশ কাঁঠালের চাকি-বেলুন এনিচি এবার — পরে কিছু নিরাশামিশ্রিত সতৃষ্ণ নয়নে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, কই — অপু, দুগ্‌গা এরা বুঝি সব বেরিয়েচে —

সর্বজয়া আর কোনোমতেই চাপিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল — ওগো দুগগা কী আর আছে গো — মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েচে — এতদিন কোথায় ছিলে!

২৪

গাঙ্গুলি বাড়ির পূজা অনেক কালের। এ কয়দিন গ্রামে অতি বড়ো দরিদ্রও অভুক্ত থাকে না। সব বনেদি বন্দোবস্ত, নির্দিষ্ট সময়ে কুমার আসিয়া প্রতিমা গড়ায়, পোটো চালচিত্র করে, মালাকার সাজ জোগায়, বারাসে-মধুখালির দ হইতে বাউরিরা রাশি রাশি পদ্মফুল তুলিয়া আনে।

আঁসমালির দীনু সানাইদার অন্য অন্য বৎসরের মতো রসুনচৌকি বাজাইতে আসিল। প্রভাতের আকাশে আগমনির আনন্দ সুর বাজিয়া ওঠে। নূতন কাপড় পরাইয়া ছেলেকে সঙ্গে লইয়া হরিহর নিমন্ত্রণ খাইতে যায়। একখানি অগোছালো চুলে-ঘেরা ছোটো মুখের সনির্বন্ধ গোপন অনুরোধ দুয়ারের পাশের বাতাসে মিশাইয়া থাকে—হরিহর পথে পা দিয়া কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে—ছেলেকে বলে, এগিয়ে চলো, অনেক বেলা গিয়েচে বাবা—।

দেখিতে দেখিতে দিন কাটিয়া গেল! শীতকালও শেষ হইতে চলিয়াছে।

দুর্গার মৃত্যুর পর হইতেই সর্বজয়া অনবরত স্বামীকে এ গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য তাগিদ দিয়া আসিতেছিল, হরিহরও নানা স্থানে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে নাই। কিন্তু কোনো স্থানেই কোনো সুবিধা হয় নাই। সে আশা সর্বজয়া আজকাল একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছে। মধ্যে গত শীতকালে হরিহরের জ্ঞাতিভ্রাতা নীলমণি রায়ের বিধবা স্ত্রী এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে মেয়ে অতসী ও ছোটো ছেলে

সুনীল। বড়ো ছেলে সুরেশ কলিকাতায় স্কুলে পড়ে, গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বে এখানে আসিতে পারিবে না।

দোলের সময় নীলমণি রায়ের বড়ো ছেলে সুরেশ কলিকাতা হইতে আসিয়া প্রায় দিনদশেক বাড়ি রহিল। সুরেশ অপুরই বয়সি, ইংরাজি ইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। সুরেশের চালচলন ও কথাবার্তার ধরন এমনি যে সে যেন প্রতিপদেই দেখাইতে চায়, গ্রামের ছেলেদের চেয়ে সে অনেক বেশি উঁচু। সমবয়সি হইলেও মুখচোরা অপু তাহাতে আরও ভয় পাইয়া কাছে ঘেঁষে না।

অপু এখনও পর্যন্ত কোনো স্কুলে যায় নাই, সুরেশ তাহাকে লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছে, আমি বাড়িতে বাবার কাছে পড়ি। দোলের দিন গাঙ্গুলিদের পুকুরে বাঁধাঘাটে জলপাইতলায় বসিয়া সুরেশ গ্রামের ছেলেদিগকে দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক পন্ডিতের ভঙ্গিতে এ প্রশ্ন ও প্রশ্ন করিতেছিল। অপুকে বলিল — বলত ইন্ডিয়ার বাউন্ডারি কী? জিয়োগ্রাফি জানো?

অপু বলিতে পারে নাই। সুরেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, অঙ্ক কী কষেচ? ডেসিমেল ফ্র্যাকশন কষতে পারো?

অপু অতশত জানে না। না জানুক, তাহার সেই টিনের বাক্সটিতে বুঝি কম বই আছে? একখানা নিত্যকর্ম পদ্ধতি, একখানা পুরোনো প্রাকৃতিক ভূগোল, একখানা শুভঙ্করী, পাতা-ছেঁড়া বীরাঙ্গনা কাব্য একখানা, মায়ের সেই মহাভারত — এই সব। সে ওই সব বই পড়িয়াছে, — অনেকবার পড়া হইয়া গেলেও আবার পড়ে। তাহার বাবা প্রায়ই এখান ওখান হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া বই আনিয়া দেয়, — ছেলে খুব লেখাপড়া শিখিবে, পন্ডিত হইবে, তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, এবিষয়ে বিকারের রোগীর মতো তাহার একটা অদম্য অপ্রশমনীয় পিপাসা। কিন্তু তাহার পয়সা নাই, দূরের স্কুলের বোর্ডিং-এ রাখিয়া দিবার মতো সংগতির একান্ত অভাব, নিজেও খুব বেশি লেখা-পড়া জানে না। তবুও যতক্ষণ সে বাড়ি থাকে নিজের কাছে বসাইয়া ছেলেকে এটা-ওটা পড়ায়, নানা গল্প করে, ছেলেকে অঙ্ক শিখাইবার জন্য নিজে একখানা শুভঙ্করীর সাহায্যে বাল্যের অধীত বিস্মৃত বিদ্যা পুনরায় ঝালাইয়া তুলিয়া তবে ছেলেকে অঙ্ক কষায়। যাহাতেই মনে করে ছেলের জ্ঞান হইবে, সেইটাই হয় ছেলেকে পড়িতে দেয়, নতুবা পড়িয়া শোনায়। সে বহুদিন হইতে 'বঙ্গবাসী'-র গ্রাহক, অনেক দিনের পুরানো 'বঙ্গবাসী' তাহাদের ঘরে জমা আছে, ছেলে বড়ো হইলে পড়িবে এজন্য হরিহর সেগুলিকে সযত্নে বান্ডিল বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, এখন সেগুলি কাজে লাগিতেছে। মূল্য দিতে না পারায় নূতন কাগজ আর তাহাদের আসে না, কাগজওয়ালারা কাগজ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ছেলে যে এই 'বঙ্গবাসী' কাগজখানার জন্য কীরূপ পাগল, শনিবার দিনটা সকালবেলা খেলাধুলা ফেলিয়া কেমন করিয়া সে যে ভুবন মুখুজ্যের চণ্ডীমণ্ডপে ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে — হরিহর তাহা খুব জানে বলিয়াই ছেলের এত আদরের জিনিসটা জোগাইতে না পারিয়া তাহার বুকের ভিতর বেদনায় টনটন করে।

পূর্ণিমার দিন রানিদের বাড়ি সত্যনারায়ণের পূজার প্রসাদ আনিতে অপু সেখানে গেল। রানি তাহাকে ডাক দিয়া হাসিমুখে বলিল — আমাদের বাড়ি তো আগে কত আসতিস, আজকাল আসিসনে কেন রে?

— কেন আসব না রানুদি — আসি তো?

রানু অভিমানের সুরে বলিল, হ্যাঁ আসিস! ছাই আসিস। আমি তোর কথা কত ভাবি। তুই ভাবিস আমার, আমাদের কথা?

—না বই কী! বারে—মাকে জিজ্ঞেস করে দেখো দিকি?

এছাড়া অন্য কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ত তাহার জোগাইল না। রানি তাহাকে সেখানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া নিজে গিয়া তাহার জন্য ফল, প্রসাদ ও সন্দেশ লইয়া আসিয়া হাতে দিল! হাসিয়া বলিল — থালা সুদ্ধ নিয়ে যা, আমি কাল গিয়ে খুড়িমার কাছ থেকে নিয়ে আসব—

রানির মুখের হাসিতে তাহার উপর একটা নির্ভরতার ভাব আসিল অপুর।

সে থালা তুলিয়া চলিয়া যাইবার সময় একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—রানুদি, তোমাদের এই পশ্চিমের ঘরের আলমারিতে যে বইগুলো আছে সতুদা পড়তে দেয় না! একখানা দেবে পড়তে? পড়েই দিয়ে যাব।

রানি বলিল—কোন বই আমি তো জানিনে, দাঁড়া আমি দেখছি—

সতু প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না, অবশেষে বলিল— আচ্ছা পড়তে দিই, যদি এক কাজ করিস। আমাদের মাঠের পুকুরে রোজ মাছ চুরি যাচ্ছে— জ্যেঠামশায় আমাকে বলেছে, সেখানে গিয়ে দুপুরবেলা চৌকি দিতে, — আমার সেখানে একা একা ভালো লাগে না, তুই যদি যাস আমার বদলে তবে বই পড়তে দেবো—

রানি প্রতিবাদ করিয়া বলিল — বেশ তো? ও ছেলে মানুষ সেই বনের মধ্যে বসে চৌকি দেবে বইকি? — যাও তোমায় বই দিতে হবে না, আমি বাবার কাছে চেয়ে দেবো —

অপু কিন্তু রাজি হইল। রানির বাবা ভুবন মুখুজ্যে বিদেশে থাকেন, তাঁহার আসিবার অনেক দেরি অথচ এই বইগুলোর উপর তাহার বড়ো লোভ। এগুলি পড়িবার লোভে সে কতদিন লুব্ধচিত্তে সতুদের পশ্চিমের ঘরটায় যাতায়াত করিয়াছে। দু-একখানা একটু আধটু পড়িয়াছেও। কিন্তু সতু নিজে তো পড়েই না, কাহাকেও পড়িতে দেয় না। নায়কের ঠিক সংকটময় মুহূর্তটিতেই হাত হইতে বই কাড়িয়া লইয়া বলে — রেখেদে অপু, এসব ছোটোকাকার বই, ছিঁড়ে যাবে, দে।

অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল।

প্রতিদিন দুপুরবেলা আলমারি হইতে বাছিয়া এক একখানি করিয়া বই সতুর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া যায় ও বাঁশবনের ছায়ায় কতকগুলো শেওড়াগাছের কাঁচা ডাল পাতিয়া তাহার উপর উপুড় শুইয়া একমনে পড়ে।

এক একখানি করিয়া সে ধরে, শেষ না করিয়া আর ছাড়িতে পারে না। চোখ টাটাইয়া ওঠে, রগ টিপ টিপ করে; পুকুরধারের নির্জন বাঁশবনের ছায়া ইতিমধ্যে কখন দীর্ঘ হইয়া মজা পুকুরটার পাটা-শেওলার দামে নামিয়া আসে, তাহার খেয়ালই থাকে না কোনদিক দিয়া বেলা গেল।

বাড়ি আসিলে তাহার মা বকে—এমন হাবলা ছেলেও তুই? পরের মাছ চৌকি দিস গিয়ে সেই একলা বনের মধ্যে বসে একখানা বই পড়বার লোভে? আচ্ছা বোকা পেয়েছে তোকে!

কিন্তু বোকা অপুর লাভ যেদিক দিয়া আসে তাহার মায়ের সেদিক সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নাই!

২৫

সেদিন দুপুরে তাহার বাবা একটা কাগজের মোড়ক দেখাইয়া হাসিমুখে বলিল — দেখো তো খোকা, কী বলো দিকি?

অপু তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল; উৎসাহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল— খবরের কাগজ? না বাবা?

সেদিন রামকবচ লিখিয়া দিয়া বেহারি ঘোষের শাশুড়ির নিকট যে তিনটি টাকা পাইয়াছে, স্ত্রীকে গোপন করিয়া হরিহর তারই মধ্যে দু-টাকা খবরের কাগজের দাম পাঠাইয়া দিয়াছিল, স্ত্রী জানিতে পারিলে অন্য পাঁচটা অভাবের গ্রাস হইতে টাকা দুইটাকে কোনোমতেই বাঁচানো যাইত না।

অপু বাবার হাত হইতে তাড়াতাড়ি কাগজের মোড়কটা লইয়া খুলিয়া ফেলে। হ্যাঁ-খবরের কাগজ বটে। সেই বড়ো বড়ো অক্ষরে, 'বঙ্গবাসী' কথাটা লেখা, সেই নতুন কাগজের গন্ধটা, সেই ছাপা, সেই সব—যাহার জন্য বৎসরখানেক পূর্বে সে তীর্থের কাকের মতো অধীর আগ্রহে ভুবন মুখুজ্যেদের চণ্ডীমণ্ডপের ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের অপেক্ষায় প্রতি শনিবারে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত! খবরের কাগজ! খবরের কাগজ! কীসব নতুন খবর না জানি দিয়াছে? কী অজানা কথা সব লেখা আছে ইহার বড়ো বড়ো পাতায়?

হরিহরের মনে হয়—দুইটি টাকার বিনিময়ে ছেলের মুখে যে আনন্দের হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহার তুলনায় কোনো বন্ধকি মাকড়ি খালাসের আত্মপ্রসাদ মোটেই বেশি হইত না!

অপু খানিকক্ষণ পড়িয়া বলে—দ্যাখো বাবা, একজন 'বিলাত যাত্রী'-র চিঠি বেরিয়েচে, আজ থেকেই নতুন বেরুলো। খুব সময়ে আমাদের কাগজটা এসেচে— না বাবা?

একদিন রানি বলিল—তোর খাতায় তুই কী লিখচিস রে?

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোন খাতায়? তুমি কী করে —

—আমি তোদের বাড়ি সেদিন দুপুরে যাইনি বুঝি? তুই ছিলিনে, খুড়িমার সঙ্গে কতক্ষণ বসে কথা বল্লাম। কেন খুড়িমা তোকে বলেনি? তাই দেখলাম তোর বই-এর দপ্তরে তোর সেই রাঙা খাতাখানায় কী সব লিখিচিস—আমার নাম রয়েচে, আর দেবী সিংহ না কী একটা—

অপু লজ্জায় লাল হইয়া বলিল—ও একটা গল্প।

—কী গল্প রে? আমায় কিন্তু পড়ে শোনাতে হবে।

পরদিন রানি একখানা ছোটো বাঁধানো খাতা অপুর হাতে দিয়া বলিল—এতে তুই আমাকে একটা

গল্প লিখে দিস— একটা বেশ ভালো দেখে। দিবি তো? অতসী বলছিল, তুই ভালো লিখতে পারিস নাকি! লিখে দে, আমি অতসীকে দেখাব।

অপু রাত্রে বসিয়া বসিয়া খাতা লেখে। মাকে বলে— আর একটা পলা তেল দাও না মা। এইটুকু লিখে রাখি আজ।

তাহার মা বলে—আজ রাত্তিরে আর পড়ে না—মোটে দু-পলা তেল আছে, কাল আবার রাঁধব কী দিয়ে ? এইখানে রাঁধছি, এই আলোতে বসে পড়ো।

অপু ঝগড়া করে।

মা বকে—এঃ, ছেলের রাত্তির হলে যত লেখা-পড়ার চাড়—সারাদিন—চুলের টিকিটি দেখবার জো নেই। সকালে করিস কী? যা তেল দেবো না।

অবশেষে অপু উনুনের পাড়ে কাঠের আগুনের আলোয় খাতা আনিয়া বসে। সর্বজয়া ভাবে—অপু আর একটু বড়ো হলে আমি ওকে ভালো দেখে বিয়ে দেবো। এ ভিটেতে নতুন পাকা বাড়ি উঠবে। আসচে বছর পৈতেটা দিয়েইনি, তারপর গাঙ্গুলিবাড়ির পুজোটা যদি বাঁধা হয়ে যায়—

...চার পাঁচদিন পরে সে রানির হাতে খাতা ফিরাইয়া দিলে। রানি আগ্রহের সহিত খাতা খুলিতে খুলিতে বলিল—লিখেচিস?

অপু হাসি হাসি মুখে বলিল — দেখো না খুলে?

রানি দেখিয়া খুশির সুরে বলিল—ওঃ অনেক লিখেচিস যে রে! দাঁড়া অতসীকে ডেকে দেখাই!

অতসী দেখিয়া বলিল—অপু লিখেচে না আরও কিছু— ইস! এসব বই দেখে লেখা।

অপু প্রতিবাদের সুরে বলিল—ইঃ, বই দেখে বইকি? আমি তো গল্প বানাই— পটুকে জিজ্ঞেস করো দিকি অতসীদিদি ওকে বিকেলে গাঙের ধারে বসে বসে কত বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলিনে বুঝি?

রানি বলিল—না ভাই, ও লিখেছে আমি জানি! ও ওই রকম লেখে। খাসা যাত্রার পালা লিখেছিল খাতাতে, আমায় পড়ে শোনালে। পরে অপুকে বলিল —নাম লিখে দিসনি তোর? নাম লিখে দে।

অপু এবার একটু অপ্রতিভতার সুরে বলিল যে, গল্পটা তাহার শেষ হয় নাই, হইলেই নাম লিখিয়া দিবে এখন! ‘সচিত্র যৌবনে-যোগিনী’ নাটকের ধরনে গল্প আরম্ভ করিলেও শেষটা কীরূপ হইবে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই। অথচ দীর্ঘ দিন তাহার কাছে খাতা থাকিলেও রানুদি—বিশেষ করিয়া অতসীদি পাছে তাহার কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ে, এই ভয়ে অসমাপ্ত অবস্থাতেই সেখানা ফেরত দিয়াছে।

মাছ ধরিবার শখ অপুর অত্যন্ত বেশি। সোনাডাঙা মাঠের নীচে ইছামতির ধারে কাঁচিকাটা খালের মুখে ছিপে খুব মাছ ওঠে। প্রায়ই সে এইখানটিতে গিয়া নদীতীরে একটা বড়ো ছাতিম গাছের তলায় মাছ ধরিতে বসে। স্থানটা তাহার ভারি ভালো লাগে, একেবারে নির্জন, দু-ধারে নদীর পাড়ে কতকী গাছপালা নদীর জলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ওপারে ঘন সবুজ উলুবন, মাঝে মাঝে লতাদোলানো কদম শিমুল গাছ, বেগুনি রং-এর বনকলমি ফুলে ছাওয়া ঝোপ, দূরে মাধবপুর গ্রামের বাঁশবন, পাখির ডাকে, বনের ছায়ায়, উলুবনের শ্যামলতায় মেশামেশি মাখামাখি স্নিগ্ধ নির্জনতা!

সেই ছেলেবেলায় প্রথম কুঠির-মাঠে আসার দিনটি হইতে এই মাঠ-বন-নদীর কী মোহ যে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। ছিপ ফেলিয়া ছাতিম গাছের ছায়ায় বসিয়া চারদিকে চাহিতেই তাহার মন অপূর্ব পুলকে ভরিয়া ওঠে।

মাছ প্রায়ই হয় না, শরের ফাতনা স্থির জলে দণ্ডের পর দণ্ড নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অটল। একস্থানে অতক্ষণ বসিয়া থাকিবার ধৈর্য তাহার থাকে না, সে এদিকে ওদিকে ছটফট করিয়া বেড়ায়, ঝোপের মধ্যে পাখির বাসার খোঁজে ফিরিয়া আসিয়া হয়তো চোখে পড়ে ফাতনা একটু একটু ঠুক্‌রাইতেছে!

এক একদিন সে এক একখানা বই সঙ্গে করিয়া আনিয়া বসে।

ছিপ ফেলিয়া বই খুলিয়া পড়ে। সুরেশের নিকট হইতে সে একখানা নীচের ক্লাসের ছবিওয়ালা ইংরাজি বই ও তাহার অর্থপুস্তক চাহিয়া লইয়াছে। ইংরাজি সে বুঝিতে পারে না, অর্থপুস্তক দেখিয়া গল্পের বাংলাটা বুঝিয়া লয় ও ইংরাজি বইখানাতে শুধু ছবি দেখে! দূর দেশের কথা ও সকলরকম মহত্বের কাহিনি ছেলেবেলা হইতেই তাহার মনকে বড়ো দোলা দেয়, এই বইখানাতে সে ধরনের অনেকগুলি গল্প আছে। কোথাকার মুক্ত প্রান্তরে একজন ভ্রমণকারী বিষম তুষারঝটিকার মধ্যে পথ হারাইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে শীতে প্রাণ হারায়, অজানা মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়া ক্রিস্টোফার কলম্বাস কীরূপে আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন— এমনি সব গল্প।

স্যার ফিলিপ সিডনির ছোট্ট গল্পটুকু পড়িয়া তাহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া যায়। সুরেশকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে— সুরেশদা, গল্পটা জানো তুমি? বড়ো করে বলো না?

সুরেশ বলে—ও জুটফেনের যুদ্ধের কথা!

অপু অবাক হইয়া বলে—কী সুরেশদা? জুটুফেন ! কোথায় সে?

সুরেশ ওইটুকুর বেশি আর বলিতে পারে না।...

সে সুরেশদার ইংরাজি ম্যাপে ভূমধ্যসাগর কোথায় দেখিয়াছে, তারই ওপারে ফ্রান্স দেশ সে জানে। কতকাল আগে ফ্রান্স দেশের বুকে তখন বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী চাপিয়া বসিয়াছে, দেশ বিপন্ন, রাজা শক্তিহীন, চারিদিকে অরাজকতা, লুঠতরাজ। জাতির এই ঘোর অপমানের দিনে, লোরেন প্রদেশের অন্তঃপাতী এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক দুহিতা পিতার মেষপাল চরাইতে যায়, আর সুনীল নয়ন দুটি আকাশের পানে তুলিয়া নির্জনে দেশের দুর্দশা চিন্তা করে। দিনের পর দিন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার নিষ্পাপ কুমারী-মনে উদয় হইল, কে তাহাকে বলিতেছে—তুমি ফ্রান্সের রক্ষাকর্ত্রী, তুমি গিয়া রাজসৈন্য জড়ো করো, অস্ত্র ধরো, দেশের জাতির পরিত্রাণের ভার তোমার হাতে! দেবী মেরি তাহার উৎসাহদাত্রী—দূর স্বর্গ হইতে তাঁহার আহ্বান আসে দিনের পর দিন। তাহার পর নবতেজোদৃপ্ত ফরাসি সৈন্যবাহিনী কী করিয়া শত্রুদলকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল, কী করিয়া ভাবময়ী কুমারী নিজে অস্ত্র ধরিয়া দেশের রাজাকে সিংহাসনে বসাইল, তাহার পর অজ্ঞানান্ধ লোকে কী করিয়া তাঁহাকে ডাইনি অপবাদে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিল, এ সকল কথাই সে আজ পড়িয়াছে।

এই বৈকাল বেলাটাতে, এই শান্ত নদীর ধারে গল্পটা ভাবিতে ভাবিতে কী অপূর্বভাবেই তাহার মন পূর্ণ হইয়া যায়!— কুমারীর যুদ্ধের কথা, জয়ের কথা, অন্য সব কথা সে তত ভাবে না। কিন্তু যে ছবিটি তাহার বারবার মনে আসে তাহা শুধু নির্জন প্রান্তরে চিন্তারতা বালিকা আর চারিধারে যদৃচ্ছ বিচরণশীল মেষদল, নিম্নে শ্যাম তৃণভূমি, মাথায় উপর মুক্ত নীল আকাশ। একদিকে দুর্ধর্ষ বৈদেশিক শত্রু, নিষ্ঠুরতা, জয়লালসার দর্প, রক্তস্রোত, — অপর দিকে এক সরলা, দিব্যভাবময়ী পল্লীবালিকা। ছবিটা তাহার প্রবর্ধমান বালক-মনকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

আরও ছবি মনে আসে! কতদূরে নীল সমুদ্রে ঘেরা মার্টিনিক দ্বীপ। চারিদিকে আখের খেত, মাথার উপর নীল আকাশ—বহু বহু দূর—শুধু নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র।—শুধু নীল আর নীল। আরও কত কী, তাহা বুঝানো যায় না—বলা যায় না।

ছিপ গুটাইয়া সে বাড়ির দিকে যাইবার জোগাড় করে।

পিছন হইতে কে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। সে জোর করিয়া হাত দিয়া চোখ ছাড়াইয়া লইতেই পটু খিল খিল করিয়া হাসিয়া সামনে আসিয়া বলিল—তোকে খুঁজে খুঁজে কোথাও পাইনে অপুদা; তারপর ভাবলাম তুই ঠিক মাছ ধরতে এইছিস, তাই এলাম। মাছ হয়নি?... একটাও না? চল বরং একখানা নৌকা খুলে নিয়ে বেড়িয়ে আসি—যাবি?

দুজনে তেঁতুলতলার ঘাট হইতে একখানা ছোট্ট-ডিঙি খুলিয়া লইয়া, তাহাতে এক ঠেলা দিয়া ডিঙির উপর চড়িয়া বসিল। নদীজলের ঠান্ডা আর্দ্রগন্ধ উঠিতেছে, কলমি শাকের দামে জলপিপি বসিয়া আছে, চরের ধারে ধারে চাষিরা পটলক্ষেত নিড়াইতেছে, কেহ ঘাস কাটিয়া আঁটি বাঁধিতেছে, চালতেপোতার বাঁকে তীরবর্তী ঘন ঝোপে গাঙশালিকের দল কলরব করিতেছে, পড়ন্ত বেলায় পুব আকাশের গায়ে নানা রঙের মেঘস্তূপ।

পটু বলিল—অপুদা একটা গান কর না? সেই গানটা সেদিনের!

অপু বলিল—সেটা নয়! বাবার কাছে সুর শিখে নিয়েছি একটা খুব ভালো গানের। সেইটে গাইব, আর এট্টু ওদিকে গিয়ে কিন্তু ভাই, এখানে ডাঙায় ওইসব লোক রয়েচে— এখানে না।

—তুই ভারি লাজুক অপুদা। কোথায় লোক রয়েচে কতদূরে, আর তোর গান গাইতে—দূর, ধর সেইটে!

খানিকটা গিয়া অপু গান শুরু করে। পটু বাঁশের চটায় বৈঠাখানা তুলিয়া লইয়া নৌকার গলুই এ চুপ করিয়া বসিয়া একমনে শোনে; নৌকা বাহিবার আবশ্যক হয় না, স্রোতে আপনা আপনি ভাসিয়া ডিঙিখানা ঘুরিতে ঘুরিতে লা-ভাঙার বড়ো বাঁকের দিকে চলে। অপুর গান শেষ হইলে পটু একটা গান ধরিল। অপু এবার বাহিতেছিল। নৌকা কম দূরে আসে নাই হঠাৎ পটু ঈশান কোণের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—ও অপুদা, কীরকম মেঘ উঠেছে দেখছিস? এখুনি ঝড় এল বলে—নৌকা ফেরাবি?

অপু বলিল—হোকগে ঝড়, ঝড়েই তো নৌকা বাইতে গান গাইতে লাগে ভালো, চল আরও যাই।

কথা বলিতে বলিতে ঘন কালো মেঘখানা মাধবপুরের মাঠের দিক হইতে উঠিয়া সারা আকাশ ভরিয়া ফেলিল; তাহার কালো ছায়া নদীজল ছাইয়া ফেলিল। পটু উৎসুক চোখে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেক দূরে সোঁ সোঁ রব উঠিল, একটা অস্পষ্ট গোলমালের সঙ্গে অনেক পাখির কলরব শোনা গেল, ঠান্ডা হাওয়া বহিল, ভিজা মাটির গন্ধ ভাসিয়া উড়িয়া আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে গাছপালা মাথা লুটাইয়া, দোলাইয়া ভাঙিয়া ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল।

নদীর জল ঘন কালো হইয়া উঠিল, তীরের সাঁইবাবলা ও বড়ো বড়ো ছাতিম গাছের ডালপালা ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, সাদা বকের দল কালো আকাশের নীচে দীর্ঘ সারি বাঁধিয়া উড়িয়া পালাইল।

অপুর বুক ফুলিয়া উঠিল, উৎসাহে উত্তেজনায় সে হাল ছাড়িয়া চারিধারে চাহিয়া ঝড়ের কাণ্ড দেখিতে লাগিল, পটু কোঁচার কাপড় খুলিয়া ঝড়ের মুখে পালের মতো উড়াইয়া দিতেই বাতাস বাধিয়া সেখানা ফুলিয়া উঠিল।

পটু বলিল—বড্ড মুখর বাতাস অপুদা, সামনে আর নৌকা যাবে না। কিন্তু যদি উলটে যায়? ভাগ্যিস সুনীলকে সঙ্গে করে আনিনি।

অপু কিন্তু পটুর কথা শুনিতেছিল না, সেদিকে তাহার কান ছিল না—মনও ছিল না। সে নৌকার গলুইয়ে বসিয়া একদৃষ্টে সম্মুখের ঝটিকাক্ষুব্ধ নদী ও আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল! তাহার চারিধারে কালো নদীর নর্তনশীল জল, উড়ন্ত বকের দল, ঝোড়ো মেঘের রাশি, দক্ষিণ দেশের মাঝিদের ঝিনুকের স্তূপগুলা, স্রোতে ভাসমান কচুরিপানার দাম সব যেন মুছিয়া যায়! নিজেকে সে 'বঙ্গবাসী' কাগজের সেই বিলাত-যাত্রী কল্পনা করে! কলিকাতা হইতে তাহার জাহাজ ছাড়িয়াছে; বঙ্গোপসাগরের মোহনায় সাগরদ্বীপ পিছনে ফেলিয়া সমুদ্র মাঝের কত অজানা ক্ষুদ্র দ্বীপ পার হইয়া, সিংহল-উপকূলের শ্যামসুন্দর নারিকেল বনশ্রী দেখিতে দেখিতে কত অপূর্ব দেশের নীল পাহাড় দূরচক্রবালে রাখিয়া সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় অভিষিক্ত হইয়া নতুন দেশের নব নব দৃশ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে!—চলিয়াছে!

সে ওইসব জায়গায় যাইবে, ওইসব দেখিবে, বিলাত যাইবে, জাপান যাইবে, বাণিজ্য-যাত্রা করিবে, বড়ো সওদাগর হইবে, অনবরত, দেশে-বিদেশে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিবে, বড়ো বড়ো বিপদের মুখে পড়িবে; এ কথা তাহার ধারণায় আসে না কতদূরে সে সব দেশ, কে তাহাকে লইয়া যাইবে, কী করিয়া তাহার যাওয়া সম্ভব হইবে! আর দিনকতক পরে বাড়ি বাড়ি ঠাকুর পূজা করিয়া যাহাকে সংসার চালাইতে হইবে, রাত্রিতে যাহার পড়িবার তেলের জন্য মায়ের বকুনি খাইতে হয়, অত বয়স পর্যন্ত যে ইস্কুলের মুখ দেখিল না, ভালো কাপড়, ভালো জিনিস যে কাহাকে বলে জানে না—সেই মূর্খ, অখ্যাত সহায়সম্পদহীন পল্লী বালককে বৃহত্তর জীবনের আনন্দ-যজ্ঞে যোগ দিতে কে আহ্বান করিবে?

কিন্তু এসকল কথা তাহার মনে ওঠে না। শুধু মনে হয়—বড়ো হইলেই সব হইবে, অগ্রসর হইলেই সকল সুযোগ-সুবিধা পথের মাঝে কুড়াইয়া পাইবে... এখন শুধু বড়ো হইবার অপেক্ষা মাত্র। সে বড়ো হইলে সুযোগ পাইবে, দিক দিক হইতে তাহার সাদর আমন্ত্রণ আসিবে,—সে জগৎ-জানার, মানুষ-জানার, মানুষ-চেনার দিগ্বিজয়ে যাইবে।

রঙিন ভবিষ্যৎ-স্বপ্নে বিভোর হইয়া তাহার বাকি পথটুকু কাটিয়া যায়। বৃষ্টি আর পড়ে না, ঝড়ে কালো মেঘের রাশি উড়াইয়া আকাশ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। তেঁতুলতলার ঘাটে ডিঙি ভিড়িতেই তাহার চমক ভাঙে ; নৌকা বাঁধিয়া পটুর আগে আগে সে বাঁশ বনের পথে উল্লাসে শিস দিতে দিতে বাড়ির দিকে চলে।

২৬

আসলে অপু কিন্তু ঘুমায় নাই, সে জাগিয়াছিল। চোখ বুজিয়া শুইয়া রাত্রে মায়ের সঙ্গে বাবার যে সব কথাবার্তা হইতেছিল, সে সব শুনিয়াছে। তাহারা এ দেশের বাস উঠাইয়া কাশী যাইতেছে। এদেশ অপেক্ষা কাশীতে থাকিবার নানা সুবিধার কথা বাবা গল্প করিতেছিল মায়ের কাছে। বাবা অল্প বয়সে সেখানে অনেকদিন ছিল, সে দেশের সকলের সঙ্গে বাবার আলাপ ও বন্ধুত্ব, সকলে চেনে বা মানে।

জিনিসপত্রও সস্তা। তাহার মা খুব আগ্রহ প্রকাশ করিল, সেসব সোনার দেশে কখনও কাহারও অভাব নাই,—দুঃখ এদেশে বারোমাস লাগিয়াই আছে, সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারিলেই সব দুঃখ ঘুচিবে। মা আজ যাইতে পাইলে আজই যায়, একদিনও আর থাকিবার ইচ্ছা নাই।

বৈশাখ মাসের প্রথমে হরিহর নিশ্চিন্দিপুর হইতে বাস উঠাইবার সব ঠিক করিয়া ফেলিল। যে জিনিসপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না, সেগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া নানা খুচরা দেনা শোধ দিয়া দিল। সেকালের কাঁঠালকাঠের বড়ো তক্তপোশ, সিন্দুক, পিঁড়ি ঘরে অনেকগুলি ছিল, খবর পাইয়া ওপাড়া হইতে পর্যন্ত খরিদ্দার আসিয়া সস্তা দরে কিনিয়া লইয়া গেল।

গ্রামের মুরুব্বিরা আসিয়া হরিহরকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিশ্চিন্দিপুরের দুগ্ধ ও মৎস্য যে কত সস্তা বা কত অল্প খরচে এখানে সংসার চলে, সে বিষয়ের একটা তুলনামূলক তালিকাও মুখে মুখে দাখিল করিয়া দিলেন। কেবল রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য স্ত্রীর সাবিত্রী-ব্রত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বলিলেন---বাপু আছেই বা কী দেশে যে থাকতে বলব—তাছাড়া এক জায়গায় কাদায় গুণ পুঁতে থাকাও কোনো কাজের নয়, এ আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি—মন ছোটো হয়ে থাকে, মনের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। দেখি এবার তো ইচ্ছে আছে চন্দ্রনাথটা সেরে আসব, যদি ভগবান দিন দেন—

রানি কথাটা শুনিয়া অপুদের বাড়ি আসিল। অপুকে বলিল—হ্যাঁরে অপু তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চলে যাবি? সত্যি?

অপু বলিল—সত্যি রানুদি, জিজ্ঞেস করো মাকে—

তবুও রানি বিশ্বাস করে না। শেষে সর্বজয়ার মুখে সব শুনিয়া রানি অবাক হইয়া গেল। অপুকে বাহিরের উঠানে ডাকিয়া বলিল — কবে যাবি রে?

—সামনের বুধবারের পরের বুধবারে—

—আসবি নে আর কখনও?

রানির চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, বলিল—তুই যে বলিস নিশ্চিন্দিপুর আমাদের বড়ো ভালো গাঁ, এমন নদী, এমন মাঠ কোথাও নেই—সে গাঁ ছেড়ে তুই যাবি কী করে?

অপু বলিল— আমি কী করব, আমি তো আর বলিনি যাবার কথা? বাবার সেখানে বাস করবার মন, এখানে আমাদের চলে না যে? আমার লেখা খাতাটা তোমাকে দিয়ে যাব রানুদি, বড়ো হলে হয়তো আবার দেখা হবে—

রানি বলিল—আমার খাতাতে গল্পটাও তো শেষ করে দিলি নে, খাতায় নাম সইও করে দিলি নে, তুই বেশ ছেলে তো অপু?

চোখের জল চাপিয়া রানি দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া গেল। অপু বুঝিতে পারে না রানুদি মিছামিছি কেন রাগ করে। সে কি নিজের ইচ্ছাতে দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে?

স্নানের ঘাটে পটুর সঙ্গে অপুর কথা হইল। পটুও কথাটা জানিত না, অপুর মুখে সব শুনিয়া তাহার মনটা বেজায় দমিয়া গেল। ম্লানমুখে বলিল—তোর জন্যে নিজে জলে নেমে কত কষ্টে শেওলা সরিয়ে ফুট কাটলাম, একদিন মাছ ধরবিনে তাতে?

এবার রামনবমীর দোল, চড়কপূজা ও গোষ্ঠবিহার অল্পদিনের পরে পরে পড়িল। প্রতি বৎসর এই সময় অপূর্ব, অসংযত আনন্দে অপুর বুক ভরিয়া তোলে। সে ও তাহার দিদি এসময় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিত। অপুর দিক হইতে অবশ্য এবারও তাহার কোনো ত্রুটি হইল না।

চড়কের দিন গ্রামের আতুরি বুড়ি মারা গেল। নতুন যে মাঠটাতে আজকাল চড়কের মেলা বসে, তাহারই কাছে আতুরি বুড়ির সেই দোচালা ঘরখানা। অনেক লোক জড়ো হইয়াছে দেখিয়া সেও সেখানে দেখিতে গেল। সেই যে একবার আতুরি ডাইনির ভয়ে বাঁশবন ভাঙিয়া দৌড় দিয়াছিল—তখন সে ছোটো ছিল—এখন তাহার সে কথা মনে হইলে হাসি পায়। আজ তাহার মনে হইল আতুরি বুড়ি ডাইনি নয়, কিছু নয়। গ্রামের একধারে লোকালয়ের বাহিরে একা থাকিত—গরিব, অসহায়, ছেলে ছিল না, মেয়ে ছিল না, কেহ দেখিবার ছিল না, থাকিলে কি আজ সারাদিন ঘরের মধ্যে মরিয়া পড়িয়া থাকিত? সৎকারের লোক হয় না? পাঁচু জেলের ছেলে একটা হাঁড়ি বাহিরে আনিয়া ঢালিল এক হাঁড়ি শুকনা আমচুর। ঝোড়ো আম কুড়াইয়া বুড়ি আমসি আমচুর তৈয়ারি করিয়া রাখিয়া দিত ও তাহা হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিত। অপু তাহা জানে, কারণ গত রথের মেলাতেও তাহাকে ডালা পাতিয়া আমসি বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে।

চড়কটা যেন এবার কেমন ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। আর-বছরও চড়কের বাজারে দিদি নতুন পট কিনিয়া কত আনন্দ করিয়াছে। মনে আছে সেদিন সকালে দিদির সহিত তাহার ঝগড়া হইয়াছিল। বৈকালে তাহার দিদি বলিল— পয়সা দেবো অপু, একখানা সীতাহরণের পট দেখিস যদি মেলায় পাস? অপু প্রতিশোধ লইবার জন্য বলিল—যত সব পানসে পুতু পুতু পট তাই তোর কিনতে হবে, আমি পারব না, যা—কেন রামরাবণের যুদ্ধ একখানা কেনো না? তাহার দিদি বলিল—তোর কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ — ছেলের যা কাণ্ড! কেন ঠাকুর-দেবতার পট বুঝি ভালো হলো না? দিদির শিল্পানুভূতি শক্তির উপর অপুর কোনো কালেই শ্রদ্ধা ছিল না।

তাহাদের বেড়ার গায়ে রাংচিতা ফুল লাল হইয়া ফুটিলে তাহার মুখ মনে পড়ে, পাখির ডাকে, সদ্যফোটা ওড়কলমির ফুলের দুলুনিতে—দিদির জন্য মন কেমন করে। মনে হয় যাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলে খুশি হইত, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কতদূর! আর কখনও, কখনও — সে এসব লইয়া খেলা করিতে আসিবে না।

মেলার গোলমালের মধ্যে কে চমৎকার বাঁশি বাজাইতেছে। নতুন সুর তাহার বড়ো ভালো লাগে—খুঁজিয়া বাহির করিল — মালপাড়ার হারান মাল এক বান্ডিল বাঁশের বাঁশি চাঁচিয়া বিক্রয় করিবার জন্য আনিয়াছে ও বিজ্ঞাপন স্বরূপ একটা বাঁশি নিজে বাজাইতেছে। অপু জিজ্ঞাসা করিল—একটা ক পয়সা? হারান মাল তাহাকে খুব চেনে। কতবার তাহাদের রান্নাঘর ছাইয়া দিয়া গিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা

করিল—তোমরা নাকি শোনলাম খোকা গাঁ ছেড়ে চল্লে? তা কোথায় যাচ্ছ—হ্যাঁগা? অপু দেড় পয়সা দিয়া সরু বাঁশের বাঁশি একটা কিনিল। বলিল, কোন কোন ফুটোতে আঙুল টেপো হারানকাকা? একবার দেখিয়ে দাও দিকি?

চড়ক দেখিয়া নানা গাঁয়ের চাষাদের ছেলেমেয়েরা রঙিন কাপড় জামা, কেউ বা নতুন কোরা শাড়ি পরনে, সারি দিয়া ঘরে ফিরিতেছে। ছেলেরা বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে। গোষ্ঠবিহারের মেলা দেখিতে চার পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও লোকজন আসিয়াছিল। শোলার পাখি, কাঠের পুতুল, রঙিন কাগজের পাখা, রং করা হাঁড়ি, ছোবা—সকলেরই হাতে কোনো না কোনো জিনিস। চিনিবাস বৈষ্ণব মেলায় বেগুনি ফুলুরির দোকান খুলিয়াছিল, তাহার দোকান হইতে অপু দু-পয়সার তেলেভাজা খাবার কিনিয়া হাতে লইয়া বাড়ির দিকে চলিল। ফিরিতে ফিরিতে মনে হইল, যেখানে তাহারা উঠিয়া যাইতেছে সেখানে কি এরকম গোষ্ঠবিহার হয়? হয়তো সে আর চড়কের মেলা দেখিতে পাইবে না। মনে মনে ভাবিল—সেখানে যদি চড়ক না হয় তবে বাবাকে বলব, আমি মেলা দেখব বাবা, নিশ্চিন্দিপুর চলো যাই—না হয় দু-দিন এসে খুড়িমাদের বাড়ি থেকে যাব?

চড়কের পরদিন জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইতে লাগিল। কাল দুপুরে আহারাদির পর রওনা হইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার মা তাহাকে গরম গরম পরোটা ভাজিয়া দিতেছিল। নীলমণি জ্যেঠার ভিটায় নারিকেল গাছটার পাতাগুলি জ্যোৎস্নার আলোয় চিক চিক করিতেছে—চাহিয়া দেখিয়া অপুর মন দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এতদিন নতুন দেশে যাইবার জন্য তাহার যে উৎসাহটা ছিল, যতই যাওয়ার দিন কাছে আসিয়া পড়িতেছে, ততই আসন্নবিরহের গভীর ব্যথায় তাহার মনের সুরটি করুণ হইয়া বাজিতেছে।

এই তাহাদের বাড়িঘর, ওই বাঁশবন, সলতে-খাগির আমবাগানটা, নদীর ধার, দিদির সঙ্গে চড়ুই ভাতি করার ওই জায়গাটা—এসব সে কত ভালোবাসে! ওই অমন নারিকেল গাছ কী তাহারা যেখানে যাইতেছে সেখানে আছে? জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত এই নারিকেল গাছ সে এখানে দেখিতেছে, জ্যোৎস্নারাত্রে পাতাগুলি কী সুন্দর দেখায়! সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রে এই দাওয়ায় বসিয়া জ্যোৎস্নাঝরা নারিকেল শাখার দিকে চাহিয়া কত রাত্রে দিদির সঙ্গে সে দশপঁচিশ খেলিয়াছে, কতবার মনে হইয়াছে কী সুন্দর দেশ তাহাদের এই নিশ্চিন্দিপুর! যেখানে যাইতেছে, সেখানে কি রান্নাঘরের দাওয়ার পাশে বনের ধারে এমন নারিকেল গাছ আছে? সেখানে কি সে মাছ ধরিতে পারিবে, আম কুড়াইতে পারিবে, নৌকা বাহিতে পারিবে, রেল রেল খেলিতে পারিবে, কদমতলার সায়েবের ঘাটের মতো ঘাট কি সে দেশে আছে? রানুদি আছে? সোনাডাঙার মাঠ আছে? এই তো বেশ ছিল তাহারা, কেন এসব মিছামিছি ছাড়িয়া যাওয়া?

দুপুরে এক কাণ্ড ঘটিল।

তাহার মা সাবিত্রীব্রতের নিমন্ত্রণে গিয়াছে, হরিহর পাশের ঘরে আহারাদি সারিয়া ঘুমাইতেছে, অপু ঘরের মধ্যে তাকের উপরিস্থিত জিনিসপত্র কী লওয়া যাইতে পারে না পারে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে। উঁচু তাকের উপর একটা কলসি সরাইতে গিয়া তাহার ভিতর একটা কী জিনিস গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। সে সেটাকে মেজে হইতে কুড়াইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। ধুলা ও মাকড়সার ঝুল মাখা হইলেও জিনিসটা কি বা তাহার ইতিহাস বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না।

সেই ছোট্ট সোনার কৌটাটা, আর বছর যেটা সেজো ঠাকরুনদের বাড়ি হইতে চুরি গিয়াছিল!

দুপুরে কেহ বাড়ি নাই, কৌটাটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, বৈশাখ দুপুরের তপ্ত রৌদ্রভরা নির্জনতায় বাঁশবনের শন্ শন্ শব্দ অনেক দূরের বার্তার মতো কানে আসে। আপন মনে বলিল— দিদি হতভাগী চুরি করে ওই কলসিটার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিইছিল!

সে একটুখানি ভাবিল, পরে ধীরে ধীরে খিড়কি-দোরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল—বহুদূর পর্যন্ত বাঁশবন যেন দুপুরের রৌদ্রে ঝিমাইতেছে, সেই শঙ্খচিলটা কোন গাছের মাথায় টানিয়া টানিয়া ডাকিতেছে, দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত প্রাচীন যুগের সেই পরাজিত ভাগ্যহত রাজপুত্রদের বেদনা করুণ মধ্যাহ্নটা! একটুখানি দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হাতের কৌটাটাকে একটান মারিয়া গভীর বাঁশবনের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার দিদি ভুলো কুকুরের ডাক দিলে যে ঘন বন-ঝোপের ভিতর দিয়া ভুলো হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিত, ঠিক তাহারই পাশে রাশীকৃত শুকনা বাঁশ ও পাতার রাশির মধ্যে বৈঁচিঝোপের ধারে কোথায় গিয়া সেটা গড়াইয়া পড়িল।

মনে মনে বলিল—রইল ওইখানে, কেউ জানতে পারবে না কোনো কথা, ওখানে আর কে যাবে?

সোনার কৌটার কথা অপু কাহাকেও কিছু জানাইল না, কখনও জানায় নাই, এমন কী মাকেও না।

দুপুর একটু গড়াইয়া গেলে হিরু গাড়োয়ানের গোরুরগাড়ি রওনা হইল। সকালের দিকে আকাশে একটু একটু মেঘ ছিল বটে, কিন্তু বেলা দশটার পূর্বেই সেটুকু কাটিয়া গিয়া পরিপূর্ণ, প্রচুর বৈশাখী-মধ্যাহ্নের রৌদ্র গাছপালায় পথে মাঠে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। পটু গাড়ির পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত আসিতেছিল, বলিল—অপুদা, এবার বারোয়ারিতে ভালো যাত্রাদলের বায়না হয়েচে, তুই শুনতে পেলিনে এবার—

অপু বলিল—তুই পালার কাগজ একখানা বেশি করে নিবি, আমায় পাঠিয়ে দিবি—

আবার সেই চড়কের মাঠের ধার দিয়া রাস্তা। মেলার চিহ্ন-স্বরূপ সারা মাঠটায় কাটা ডাবের খোলা গড়াগড়ি যাইতেছে, কাহারা মাঠের একপাশে রাঁধিয়া খাইয়াছে, আগুনে কালো মাটির ঢেলা ও একপাশে কালিমাখা নতুন হাঁড়ি পড়িয়া আছে। হরিহর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, তাহার যেন কেমন ঠেকিতেছিল। কাজটা কি ভালো হইল? কতদিনের পৈতৃক ভিটা, ওই পাশের পোড়ো ভিটাতে সেসব ধুমধাম একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছিলই তো, যা-ও-বা মাটির প্রদীপ টিম টিম করিতেছিল, আজ সন্ধ্যা হইতে চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল। পিতা রামচাঁদ তর্কবাগীশ স্বর্গ হইতে দেখিয়া কী মনে করিবেন?

গ্রামের শেষ বাড়ি হইতেছে আতুরি বুড়ির সেই দোচালা ঘরখানা, যতক্ষণ দেখা গেল অপু হাঁ করিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পরই একটা বড়ো খেজুর-বাগানের পাশ দিয়া গাড়ি গিয়া একেবারে আষাঢ়ু যাইবার বাঁধা রাস্তার উপর উঠিল। গ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বজয়ার মনে হইল যা কিছু দারিদ্র্য, যা কিছু হীনতা, যা কিছু অপমান সব রহিল পিছনে পড়িয়া—এখন সামনে শুধু নতুন সংসার, নতুন জীবনযাত্রা, নব সচ্ছলতা।

ক্রমে রৌদ্র পড়িল—গাড়ি তখন সোনাডাঙার মাঠের মধ্য দিয়া যাইতেছিল।

সোনাডাঙার মাঠ এ অঞ্চলের সকলের বড়ো মাঠ। এখানে ওখানে বনঝোপ, শিমুল বাবলা গাছ, খেজুর গাছে খেজুরের কাঁদি ঝুলিতেছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলিতেছে, চারিধারে বউ-কথা-কও পাপিয়ার ডাক। দূর প্রসারী মাঠের উপর তিসির ফুলের রঙের মতো গাঢ় নীল আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টি কোথাও বাধে না, ঘন সবুজ ঘাসে মোড়া উঁচু-নীচু মাঠের মধ্যে কোথাও আবাদ নাই, শুধুই গাছ-পালা-বনঝোপের প্রাচুর্য আর বিশাল মাঠটার শ্যামপ্রসার, সম্মুখে কাঁচা মাটির চওড়া পথটা গৃহত্যাগী উদাস বাউলের মতো দূর হইতে দূরে আপন মনে বাঁকিয়া চলিয়াছে। একটু দূরে গিয়া বারাসে-মধুখালির বিল পড়িল। কোন প্রাচীনকালের নদী শুকাইয়া গিয়া জীবনের যাত্রাপথের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, অন্তর্হিত নদীর বিশাল খাতটা এখনি পদ্মফুলে ভরা বিল। অপু গাড়িতে বসিয়া মাঠ ও চারিধারের অপূর্ব আকাশের রংটা দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল। বেলা শেষের স্বপ্নপটে আবার কত কী শৈশব কল্পনার আসা যাওয়া! এই তো সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়াছে! এখন হয়তো কোথায় কতদূরে চলিবে, যাওয়া তার সবে আরম্ভ হইল, এইবার হয়তো সে সব দেশ, স্বপ্ন-দেখা সে অপূর্ব জীবন!

বাংলার বসন্ত, চৈত্র-বৈশাখের মাঠে, বনে বাগানে, যেখানে সেখানে, কোকিলের এলোমেলো ডাকে, নবপল্লব নাগকেশর গাছের অজস্র ফুলের ভারে, বনফুলের গন্ধভরা জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ দক্ষিণহাওয়ায় উল্লাসে আনন্দনৃত্য শুরু করিয়াছে। এরূপ অপরূপ বসন্তদৃশ্য অপু জীবনে এই প্রথম দেখিল।

রাত্রি প্রায় দশটায় সময় স্টেশনে আসিয়া গাড়ি পৌঁছিল। আজ অনেকক্ষণ হইতেই কখন গাড়ি স্টেশনে পৌঁছাইবে সেই আশায় অপু বসিয়া ছিল, গাড়ি থামিতেই নামিয়া সে একদৌড়ে গিয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হাজির হইল। সন্ধ্যা সাড়ে আটটার ট্রেন অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিয়াছে সারারাত্রির মধ্যে আর ট্রেন নাই। ওই হিরু গাড়োয়ানের গোরু দুইটার জন্যই এরূপ ঘটিল, নতুবা এখনই সে ট্রেন দেখিতে পাইত। প্ল্যাটফর্মে একরাশ তামাকের গাঁট সাজানো—দুজন রেলের লোক একটা লোহার বাক্স মতো দেখিতে অথচ খুব লম্বা ডান্ডাওয়ালা কলে তামাকের গাঁট চাপাইয়া কী করিতেছে। জ্যোৎস্না পড়িয়া রেলের পাটি চিক চিক করিতেছে। ওদিকে রেললাইনের ধারে একটা উঁচু খুঁটির গায়ে দুটা লাল আলো, এদিকে আবার ঠিক সেইরকম দুটা লাল আলো। স্টেশনের ঘরে টেবিলের উপর চৌপায়া তেলের লণ্ঠন জ্বলিতেছে। একরাশ বাঁধানো খাতাপত্র। অপু দরজার কাছে গিয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিল, একটা ছোট্ট খড়মের বউলের মতো জিনিস টিপিয়া স্টেশনের বাবু খট খট শব্দ করিতেছে।

ইস্টিশান! ইস্টিশান! বেশি দেরি নয়, কাল সকালেই সে রেলের গাড়ি শুধু যে দেখিবে তাহা নয়, চড়িবেও!

প্ল্যাটফর্ম হইতে নড়িতে তাহার মন সরিতেছিল না। কিন্তু তাহার বাবা ডাকিতে আসিল। খড়মের বউলের মতো জিনিসটাই নাকি টেলিগ্রাফের কল তাহার বাবা বলিল।

অপু ফিরিয়া দেখিল স্টেশনের পুকুর-ধারে রাঁধিয়া খাইবার জোগাড় হইতেছে। আর একখানি গাড়ি পূর্ব হইতেই সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। আরোহীর মধ্যে আঠারো-উনিশ বৎসরের এক বউ ও একটি যুবক। অপু শুনিল বউটি হবিবপুরের বিশ্বাসদের বাড়ির, ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ি যাইতেছে। তাহার মায়ের সঙ্গে বউটির খুব ভাব হইয়া গিয়াছে। তাহার মা খিচুড়ির চালডাল ধুইতেছে, বউটি আলু ছাড়াইতেছে। রান্না একত্র হইবে।

সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন আসিল। অপু হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ হইতে গাড়ি দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মের ধারে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার বাবা বলিল, খোকা, অত ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থেকো না, সরে এসো এদিকে। একজন খালাসিও লোকজনদের হটাইয়া দিতেছিল।

কত বড়ো ট্রেনখানা! কী ভয়ানক শব্দ! সামনের একেই ইঞ্জিন বলে? উঃ, কী কাণ্ড!

হবিবপুরের বউটি ঘোমটা খুলিয়া কৌতূহলের সহিত প্রবেশমান ট্রেনখানার দিকে চাহিয়াছিল।

গাড়িতে হই হই করিয়া মোট-ঘাট সব উঠানো হইল। কাঠের বেঞ্চি সব মুখোমুখি করিয়া পাতা। গাড়ির মেজেটা যেন সিমেন্টের বলিয়া মনে হইল। ঠিক যেন ঘর একখানা; জানালা দরজা সব হুবহু! এই ভারী গাড়িখানা, যাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যে আবার চলিবে, সে বিশ্বাস অপুর হইতেছিল না। কী জানি হয়তো নাও চলিতে পারে; হয়তো উহারা এখনই বলিতে পারে, ওগো তোমরা সব নামিয়া যাও, আমাদের গাড়ি আজ আর চলিবে না! তারের বেড়ার এদিকে একজন লোক একবোঝা উলুঘাস মাথায় করিয়া ট্রেনখানা চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল, অপুর মনে হইল লোকটা কৃপার পাত্র! আজিকার দিনে যে গাড়ি চড়িল না সে বাঁচিয়া থাকিবে কী করিয়া? হিরু গাড়োয়ান ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া গাড়ির দিকে চাহিয়া আছে।

গাড়ি চলিল। অদ্ভুত, অপূর্ব দুলুনি! দেখিতে দেখিতে মাঝেরপাড়া স্টেশন, লোকজন, তামাকের গাঁট, হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া-থাকা হিরু গাড়োয়ান সকলকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ি বাহিরের উলুখড়ের মাঠে আসিয়া পড়িল। গাছপালাগুলা সটসট করিয়া দু-দিকের জানালার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে—কী বেগ! এরই নাম রেলগাড়ি! উঃ মাঠখানা যেন ঘুরাইয়া ফেলিতেছে। ঝোপঝাপ, গাছপালা, উলুখড়ের ছাউনি ছোটো-খাটো চাষাদের ঘর সব একাকার করিয়া দিতেছে! গাড়ির তলায় জাঁতা-পেষার মতো একটানা শব্দ হইতেছে—সামনের দিকে ইঞ্জিনের কী শব্দটা!

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্ট্যান্ট সিগনালখানাও ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে।

অনেকদিন আগের সে দিনটা।

সে ও দিদি যেদিন দুজনে বাছুর খুঁজিতে খুঁজিতে মাঠজলা ভাঙিয়া উর্ধ্বশ্বাসে রেলের রাস্তা দেখিতে ছুটিয়া গিয়াছিল! সেদিন—আর আজ?

ওই যেখানে আকাশের তলে আষাঢু দুর্গাপুরের বাঁধা সড়কের গাছের সারি ক্রমশ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওরই ওদিকে যেখানে তাহাদের গাঁয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে

উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে, গ্রামের প্রান্তের বুড়ো জামতলাটায় তাহার দিদি যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ির দিকে চাহিয়া আছে!...

তাহাকে কেহ লইয়া আসে নাই, সবাই ফেলিয়া আসিয়াছে, দিদি মারা গেলেও দুজনের খেলা করার পথেঘাটে বাঁশবনে আমতলায় সে দিদিকে যেন এত দিন কাছে কাছে পাইয়াছে, দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা কোঠাবাড়ির প্রতি গৃহ-কোণে—আজ কিন্তু সত্যসত্যই দিদির সহিত চিরকালের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল!...

তাহার যেন মনে হয় দিদিকে আর কেহ ভালোবাসিত না, মা নয়, কেউ নয়। কেহ তাহাকে ছাড়িয়া আসিয়া দুঃখিত নয়।

হঠাৎ অপুর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল! তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়, তাহা কী সে জানে না। কত কী মনে আসিল অল্প এক মুহূর্তের মধ্যে... আতুরি ডাইনি...নদীর ঘাট... তাহাদের কোঠাবাড়িটা... চালতেতলার পথ... রানুদি... কত বৈকাল, কত দুপুর... কতদিনের কত হাসি-খেলা... পটু... দিদির মুখ... দিদির কত না-মেটা সাধ...

দিদি এখনও একদৃষ্টে চাহিয়া আছে...

পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যের অবাক-ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বার বার বলিতে চাহিল—আমি চাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি—ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে —

সত্যই সে ভুলে নাই!

উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখনই গতির পুলকে তাহার সারা দেহ শিহরিয়া উঠিতে থাকিত, সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক হইতে প্রতি মুহূর্তে নীল আকাশের নব নব মায়ারূপ চোখে পড়িত, হয়তো দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত কোনো নীল পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীন চক্রবাল-সীমায় দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইয়া পড়িত, দূরের অস্পষ্ট আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া বেলাভূমি এক প্রতিভাশালী সুরস্রষ্টার প্রতিভার দানের মতো মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে—তখনই, এইসব সময়েই, তাহার মনে পড়িত এক ঘনবর্ষার রাতে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরোনো কোঠার অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াঁগায়ের গরিব ঘরের মেয়ের কথা—

অপু সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্ট্যান্ট সিগনালখানা দেখিতে দেখিতে কতদূরে অস্পষ্ট হইতে হইতে শেষে মিলাইয়া গেল।

হাতে কলমে

১. **অতি সংক্ষেপে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

১.১ কুঠির মাঠ দেখতে যাবার পথে কী দেখে অপু সব থেকে বেশি অবাক হয়েছিল?

১.২ আলকুশি কী?

১.৩ 'এই দ্যাখো মা আমার সেই মালাটা'— কে, কখন এই কথা বলেছে?

১.৪ অপু কার পাঠশালায় পড়তে গিয়েছিল? গুরুমশাই পড়ানোর পাশাপাশি আর কোন কাজ করতেন?

১.৫ পাঠশালা কখন বসতো? কজন ছাত্রছাত্রী ছিল?

১.৬ আতুরি ডাইনি কে? বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সম্পর্কে অপুর ধারণা বদলে গেলো কীভাবে?

১.৭ লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ি থেকে ফিরে এসে অপু যে আশ্চর্য ভ্রমণকাহিনি শুনিয়েছিল তা লেখো।

১.৮ অপু কড়ি খেলতে কোথায় গিয়েছিল? তার সঙ্গীসাথি কারা ছিল লেখো।

১.৯ 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' বইটিতে মানুষের ওড়ার ব্যাপারে কী লেখা ছিল?

১.১০ 'আমি মরবার সময় বইখানা তোমায় দিয়ে যাব দাদু।'— কে, কাকে একথা বলেছিলেন? কোন বইখানি দিয়ে যাবার কথা ছিল?

১.১১ অপুর দপ্তরে কী কী বই ছিল? কোন মাসিক পত্রিকা হাতে নিয়ে অপুর মন নানা কল্পনায় ভরে উঠত?

১.১২ 'দুর্গা কতবার খুঁজিয়াছে, ও খেলা আর কোনো দিন আসে নাই।'— কোন খেলার কথা বলা হয়েছে, লেখো।

১.১৩ অপু বসে বসে খাতায় কী লেখে?

১.১৪ অপুর টিনের বাক্সতে কী কী বই ছিল?

১.১৫ 'তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চলে যাবি?'— কে, কাকে এ কথা বলেছে? কোন গাঁয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে?

১.১৬ 'রইল ওইখানে, কেউ জানতে পারবে না কোনো কথা, ওখানে আর কে যাবে?'— কী রইল? এখানে কোন জিনিসের কথা বলা হয়েছে?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে লেখো:**

২.১ দুর্গা-অপুর খেলাধুলোর সরঞ্জাম বলতে কী ছিল লেখো।

২.২ অপুর পাঠশালাটি কেমন ছিল?

২.৩ আশ মিটিয়ে যুদ্ধ জিনিসটা উপভোগ করার জন্য অপু কী করত?

২.৪ দুর্গা তো পাঠশালায় যেতো না, তার সারাদিন কীভাবে কাটত, লেখো।

২.৫ বাছুর খুঁজতে বেরিয়ে দুর্গা-অপু কীভাবে পথ হারিয়ে ফেলেছিল?

২.৬ রাজকৃষ্ণ সান্যালের দেশভ্রমণের গল্পগুলি কেমন ছিল?

২.৭ 'একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা হইয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা'।— অপুর জীবনের সেই নতুন অভিজ্ঞতাটি কী?

২.৮ দুর্গা-অপু কীভাবে রেলের রাস্তা দেখার চেষ্টা করেছিল?

২.৯ 'বাঁকা কঞ্চি অপুর জীবনের এক অদ্ভুত জিনিস।'— এ কথা বলার কারণ কী? সামান্য উপকরণ নিয়ে খেলার আনন্দ সম্পর্কে লেখো।

২.১০ শূন্যে ওড়ার ক্ষমতা অর্জনের জন্য অপু কী করেছিল?

২.১১ ভুলো কুকুরকে নিয়ে দুর্গা কীভাবে আমোদ উপভোগ করত?

২.১২ বৃদ্ধ নরোত্তম বাবাজির সঙ্গে অপুর কীভাবে ভাব হয়েছিল?

২.১৩ অপু-দুর্গার চড়ুইভাতির আয়োজন সম্পর্কে লেখো। এখনকার পিকনিকের সঙ্গে এরকম চড়ুইভাতির তফাৎ কোথায়?

২.১৪ অজয় কে? তার সঙ্গে অপুর বন্ধুত্ব হল কীভাবে?

২.১৫ অপু তার দিদির সঙ্গে কেন কখনও আড়ি করবে না?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলি নিজের ভাষায় বিশদে লেখো:**

৩.১ বাবার সঙ্গে অপুর কুঠির মাঠ দেখতে যাবার অভিজ্ঞতাটি লেখো। 'কুঠিবাড়ি' বলতে তুমি কী বোঝো?

৩.২ ছবি-দেখে-চেনা কোনো কিছু হঠাৎ চোখের সামনে চলে এলে কেমন লাগে? অপুর খরগোশ দেখার মতো তোমার হঠাৎ অবাক হবার মতো কোনো ঘটনা লেখো।

৩.৩ কালবৈশাখী ঝড়ে দুর্গা-অপুর আম কুড়নোর ঘটনাটি লেখো। ঝড়বৃষ্টিতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে তা উপভোগ করার তোমার কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে তা লেখো।

৩.৪ যে দিন অপু প্রথম পাঠশালা গেল সেদিনের কথা লেখো। তোমার প্রথম স্কুলে যাবার দিনটি মনে পড়ে? সেদিনের কথা তোমার যা মনে আছে লেখো।

৩.৫ 'অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই '— 'পথের পাঁচালী'তে দুর্গা আর অপু নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে থেকেই কীভাবে বারে বারে অচেনার আনন্দ অনুভব করেছে লেখো।

৩.৬ হরিহরের সঙ্গে মহাজনবাড়িতে গিয়ে অপু কীভাবে প্রথম নিজেদের দারিদ্র্য সম্পর্কে সচেতন হলো, লেখো।

৩.৭ দুর্গা-অপুর যে নানান খেলার কথা উপন্যাসে আছে সেগুলির কথা লেখো। হার-জিত আছে এমন খেলার সঙ্গে এ জাতীয় খেলার তফাৎ কী? তুমি কী ধরনের খেলা পছন্দ করো এবং কেন তা লেখো।

৩.৮ মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে অপুর কর্ণের চরিত্র বড়ো ভালো লাগে কেন?

৩.৯ মহাভারতে তোমার প্রিয় চরিত্র কোনটি? কেন তাকে তোমার ভালো লাগে, লেখো।

৩.১০ 'সে জগৎ জানার, মানুষ জানার, মানুষ চেনার দিগ্বিজয়ে যাইবে' — কার কথা বলা হয়েছে? ভবিষ্যতের যে রঙিন স্বপ্নে সে বিভোর তার কথা লেখো।